সাধুচরিত

সাধুচরিত

শ্রী(অতুলচন্দ্র)ঘটক বি. এ.
প্রণীত।

বঙ্গসাহিত্যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, কলিকাতা রিপণকলেজের প্রিন্সিপাল,
প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার
শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম. এ.,
লিখিত "ভূমিকা" সংবলিত।

Calcutta
S. K. LAHIRI & CO.
54, COLLEGE STREET
1911

মূল্য আট আনা।



PRINTED BY JYOTISH CHANDRA GHOSH
57, HARRISON ROAD, CALCUTTA.

বঙ্গের কৃতি-সন্তান,

অশেষসম্মানাস্পদ, বিদ্যোৎসাহী,

শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

এম্. এ., বি, এল., সি. এস্. আই,

মহোদয়ের

করকমলে

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত

উৎসর্গীকৃত হইল।

ভূমিকা

বাল্যকালে পল্লীগ্রামের নিভৃত গৃহে বসিয়াই 'সত্যপ্রিয়' রামতনু লাহিড়ীর নাম শুনিয়াছিলাম; উত্তরকালে মহানগরে আসিয়া নানা জনের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে নানা কাহিনী শুনিয়াছি। তাঁহার চরণ-দর্শন-সৌভাগ্য আমার কখনও ঘটে নাই। কিন্তু তাঁহার পূত জীবনের পুণ্যকথা শুনিয়া পুণ্যসঞ্চয়ের অবসর অনেক সময় পাইয়াছি।

স্বর্গীয় মহাত্মার জীবন কর্ম্মবহুল ছিল না; অসাধারণ চারিত্রবলই তাঁহার পাথেয় ছিল; সেই পাথেয় লইয়া তিনি জীবনের পথ অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদস্পর্শে পৃথিবীর ধূলি পাংশুলতা ত্যাগ করিয়াছিল; তাঁহার মুখনিঃসৃত বাণী পৃথিবীর অনিলকে সৌরভময় করিয়া গিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা এবং সরলতা তাঁহার ভূষণ ছিল। এই ভূষণে যিনি মণ্ডিত, পার্থিব ঐশ্বর্য্যের কর্দ্দমে তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না। নিষ্ঠাবতী ভক্তি তাঁহার চরিত্রে বলাধান করিয়াছিল; এই বলে যিনি বলীয়ান্, সংসারের বিভীষিকা তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে পারে না।

তাঁহার আড়ম্বরহীন জীবনের অবসান ঘটিয়াছে; যে স্মৃতি অবশিষ্ট আছে, তাহা পুণ্যময়ী। তাঁহার নাম স্মরণে,

তাঁহার নাম কীর্ত্তনে পুণ্য আছে। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার সঙ্কলনকর্ত্তা শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘটক সেই পুণ্যসঞ্চয়ের সুযোগ দিয়া বঙ্গের পাঠক-পাঠিকাগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের সত্যপ্রিয়তা ও সরলতা সম্বন্ধে নানা আখ্যায়িকা লোকমুখে শুনিয়াছি। এই ক্ষুদ্র-পুস্তিকায় সেই আখ্যায়িকাগুলির স্থান হয় নাই। তাঁহার যে বৃহত্তর জীবনচরিত বাঙ্গালায় রচিত ও ইংরেজিতে অনূদিত হইয়াছে, তাহাতেও সম্পূর্ণ সঙ্কলন হইয়াছে, বোধ হয় না। লাহিড়ী মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রের নিকট আমরা তাহার সম্পূর্ণ সঙ্কলন প্রত্যাশা করি। তিনি যে পৈতৃক ধনে ধনবান্, তাঁহার স্বদেশের ভ্রাতৃগণকে তাহার অংশাধিকারে বঞ্চিত করিবেন কেন?

লাহিড়ী-মহাশয়ের জীবনের মধ্যাহ্নকালে বঙ্গদেশের ইতিহাসে এক নূতন পরিচ্ছেদের সূচনা হয়। অনেক পুরাতন জিনিষ ভাঙিবার চেষ্টা হইয়াছিল; অনেক নূতন জিনিষ গড়িবার চেষ্টা হইয়াছিল। তজ্জন্য যে কোলাহল উঠিয়াছিল, তাহার প্রতিধ্বনি এখনও থামে নাই। আমাদের ইতিহাসের সেই অধ্যায়, এখনও সমুচিত যত্নের সহিত লিখিত হয় নাই। যে সকল মহাত্মা এই ভাঙা-গড়া

ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তাঁহাদের জীবন-কাহিনী জানিবার জন্য ভবিষ্যতের বাঙালী উৎকর্ণ থাকিবে। এই জন্যও এই ক্ষুদ্রগ্রন্থের যথোচিত মূল্য হইবে।

স্বর্গগত রামতনু লাহিড়ী যে কয়জন পুণ্যশ্লোক মহাত্মার স্পর্শে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে লইয়া নূতন করিয়া আমাদের প্রাতঃস্মরণীয় নামমালা গ্রথিত হইতে পারে। আমাদের নব্যবঙ্গের নূতন জীবনের প্রাক্‌কালে এই নামমালা গাঁথিয়া দিবে কে, তাহা দেখিবার জন্য আমার হৃদয় লালায়িত রহিয়াছে।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা সেই কর্ম্মে কিঞ্চিৎ সাহায্য করিবে। বঙ্গের গৃহে গৃহে ইহা এই নিমিত্ত আদৃত হউক, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

নিবেদন।

বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথিতযশা, কলিকাতা রিপণ কলেজের অধ্যক্ষ, বিজ্ঞানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত রামেন্দ্র-সুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই সামান্য গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। এই অকিঞ্চন গ্রন্থ তাঁহার লিখিত ভূমিকা-ভূষণে সজ্জিত হইবে, এ আশা আমি কখনও করি নাই। এই অনুগ্রহের নিমিত্ত আমি তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপূর্ণচিত্তে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

এই পুস্তকের অনেকাংশ লব্ধপ্রতিষ্ঠ "সাহিত্য"-সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক দেখিয়া দিয়াছেন; এবং সমগ্র পুস্তক-খানির প্রুফ ভক্তিভাজন মদীয় অধ্যাপক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় যত্নপূর্ব্বক সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। ইহাঁদের উৎসাহ না পাইলে, "সাধুচরিত" প্রকাশিত হইত কি না সন্দেহ। আমি ইহাঁদের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ রহিলাম।

বলা বাহুল্য এই পুস্তক প্রণয়নে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী প্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন

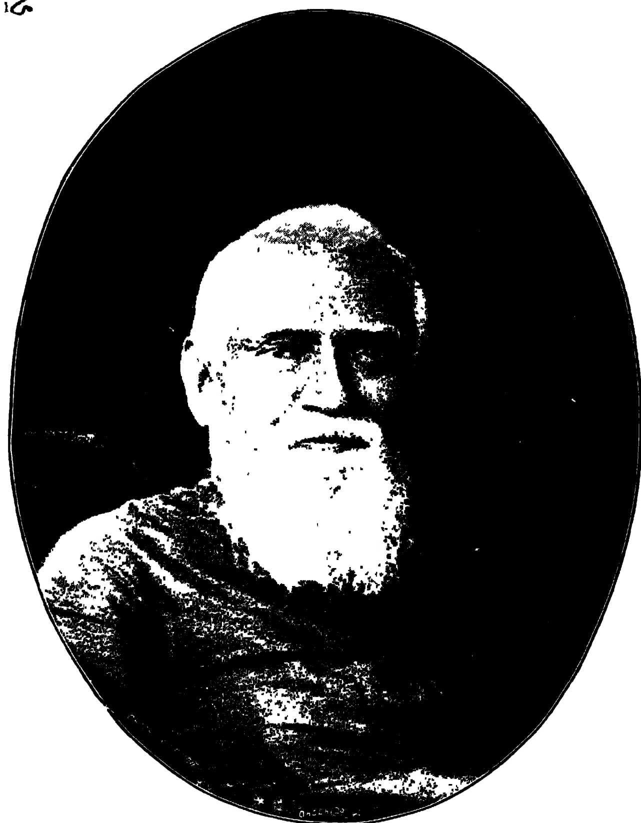
বঙ্গসমাজ” নামক গ্রন্থ হইতে স্থানে স্থানে কথঞ্চিৎ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

যাঁহার স্নেহে এবং অনুগ্রহে আমি বৰ্দ্ধিত, যিনি আমার সমস্ত চেষ্টা ও উদ্যমের উৎসাহদাতা, সেই নিরালস্য কর্ম্মবীর শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁহার নিরন্তর বহুবিধ সাহায্যের জন্য ভক্তিপূর্ণচিত্তে ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিতেছি না। এতদ্ভিন্ন যাঁহারা আমাকে সদুপদেশ দান করিয়া উৎসাহিত করিয়াছেন, এই অবসরে আমি সকলের নিকটেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

কলিকাতা,
বৈশাখ, ১৩১৮

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক

১৫



স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী [প্রথম পৃষ্ঠা

ART PRESS

সাধুচরিত।

উপক্রমণিকা।

বহুসহস্র বৎসর পূর্ব্বে মহর্ষি বাল্মীকি তমসাতীরে বসিয়া গাহিয়া গিয়াছেন —

"বাতি গন্ধঃ সুমনসাং প্রতিবাতং সদৈব হি।
ধর্ম্মজস্তু মনুষ্যাণাং বাতি গন্ধঃ সমন্ততঃ॥"

কুসুম-সৌরভ কেবল অনুকূল বায়ুভরেই বিকীর্ণ হয়, কিন্তু মানুষের ধর্ম্মজীবনের সৌরভ চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইয়া থাকে।

অসীম অনন্তবিস্তৃত সংসার-সাগরে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় মানুষ উঠিতেছে, পড়িতেছে, লয় পাইতেছে। মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, দুদিনের খেলা খেলিয়া আবার কোন্ অজ্ঞাত প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। কাল-প্রবাহ কাহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যায়, তাহার খোঁজ

নাই, তাহার মীমাংসা নাই। তাই বড় উচ্চকণ্ঠে কবি গাহিয়াছেন —

"সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে,
মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।"

তিনিই সুকৃতিমান, যিনি লোকের মনোমন্দিরে নিত্য সেবা পাইয়া থাকেন। যেস্থানে দুদিন অগ্রপশ্চাতে সকলেরই এক গতি, যেখানে মনুষ্যজীবন জলবিম্ববৎ ক্ষণবিদ্ধংসী, জলে মিশিয়া গেলে আর চিহ্নমাত্রও থাকিবার সম্ভাবনা নাই, সেই পৃথিবীতে যিনি লোকের মনোমন্দিরে নিত্য নিভৃতে পূজা প্রাপ্ত হন, তিনি নরকুলে ধন্য সন্দেহ নাই। বাহিরের মন্দিরে যাঁহার পূজা হয়, অনেক সময় সে পূজার উপকরণাদি আহরণে বিব্রত হইতে হয়, কিন্তু মনোমন্দিরে যাঁহার আসন, তাঁহার সেবার জন্য দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহে ছুটাছুটি করিতে হয় না। ভক্তিচন্দনে প্রেমপুষ্প চর্চ্চিত করিয়া লোক-চক্ষুর অন্তরালে সে পূজাকৃত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মানব-জগতে সাধারণ মানবচক্ষে তিনি মৃত হইলেও, তাঁহার পার্থিব দেহ ধূলিরাশিতে মিশিয়া গেলেও, তাঁহার জীবনের প্রভাব চিরদিনই মানুষকে ধর্ম্মে এবং নীতিতে অনুপ্রাণিত করে। স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবন চরিত আলোচনা করিলে আমরা

ইহার যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি আজীবন শিক্ষাদান কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। বিদ্যার্থিগণের কোমল হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজের সহিত পবিত্রতা সত্যনিষ্ঠা এবং ভগবদ্ভক্তির বীজ বপন করিতে তিনি সতত যত্নশীল ছিলেন। বালকগণের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তি জন্মানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ও লক্ষ্য ছিল। অসত্যকে এবং অন্যায়কে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। যদিও বহুদিন হইল তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন, তথাপি আজিও তাঁহার পুণ্যজীবনের অমৃতময় প্রভাবে বাঙ্গালী কর্ত্তব্যে, ধর্ম্মে এবং নীতিতে অনুপ্রাণিত হইতেছে।

ঝটিকাসংক্ষুব্ধ অন্ধকারময় সাগরবক্ষে পোতাধ্যক্ষ যেমন দূরস্থিত আলোকস্তম্ভের ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখিয়া পোতের গতি নিয়ন্ত্রিত করে, তেমনি অশেষ দুঃখদুর্দ্দশাপূর্ণ সংসার-সাগরে মানুষ যখন নানা বিপদের আবর্ত্তে পড়িয়া জ্ঞানহারা হইয়া যায়, তখন সাধুপুরুষদিগের জীবনের ঘটনাবলী আলোচনা করিয়া প্রাণে বল পায়; কেমন ধীর স্থির ভাবে তাঁহারা সকল জ্বালা-যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতে করিতে প্রাণে আশার সঞ্চার হয়, ক্রমে কষ্ট সহ্য করিবার শক্তি জন্মে। সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর শোক পুত্রশোক, উপযুক্ত পুত্রের

অকালমৃত্যু অপেক্ষা মানুষের জীবনে কষ্টকর ঘটনা বোধ হয় আর কিছুই নাই। জ্যেষ্ঠপুত্র কৃতী নবকুমার এবং তাহার কিয়দ্দিন পূর্ব্বে দ্বিতীয়া কন্যা অশেষগুণ-সম্পন্না শোভনা ইন্দুমতীর অকালমৃত্যুতে রামতনুবাবু কিরূপ ধীর এবং অবিচলিত ছিলেন, ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়। এতদ্ভিন্ন জীবনে তিনি বহু দুঃখ, শোক, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা সহ্য করিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃত ঋষির ন্যায় একদিনের তরেও তাঁহার নির্ম্মল হৃদয় ভগবানের প্রতি অবিশ্বাসের ছায়াপাতে মলিন হয় নাই। এক্ষণে ব্রাহ্মগণের নাম আছে, প্রতিপত্তি আছে, স্বতন্ত্র সমাজ আছে, কিন্তু এই দৃঢ়চিত্ত পুরুষ যখন ভগবানের প্রতি দৃঢ়বিশ্বাসে প্রাণ সবল করিয়া উপবীত পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন ইহার কিছুই ছিল না। রামতনুবাবুর জীবনের মন্ত্র ছিল,—"যাহা সৎ, তাহাই কর্ত্তব্য, ফলাফল ভগবানের।" বন্ধুবর্গ ও ছাত্রগণ তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; তাঁহারাই বিপদের সময় নানারূপে তাঁহার যন্ত্রণা লাঘব করিতে সযত্ন হইতেন। কিন্তু ভগবানে যিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, পার্থিব দুঃখকষ্টে কি তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে? জলযানস্থিত কম্পাসের কাঁটা, প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে তরণী নানা দিকে ঘুরিলেও যেমন উত্তরদিকই নির্দ্দেশ

করে, তেমনি পৃথিবীতে বহুতুঃখের ঘাতপ্রতিঘাতে ক্লিষ্ট হইলেও তাঁহার মন অনুক্ষণ করুণাময় ভগবানেই নিবদ্ধ ছিল।

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ভিন্ন মানুষের উন্নতি হয় না। উচ্চাভিলাষ মহত্ত্বলাভের সোপানস্বরূপ। আকাঙ্ক্ষা যাঁহার উচ্চ, মন যাঁহার সবল, কর্ত্তব্যসাধনে যিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এবং অহঙ্কার যাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে না, এ পৃথিবীতে তাঁহার উন্নতিলাভ অবশ্যম্ভাবী। রামতনু বাবুর অন্তঃকরণে চিরকাল ভাল হইবার ইচ্ছা বলবতী ছিল। কার্য্যে ও বাক্যে তিনি সতত সাধুতালাভের প্রয়াসী ছিলেন। একবার কয়েকটি বন্ধু তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের সরল, প্রাণখোলা আলাপে তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কথা বলিতে বলিতে আবশ্যকবশতঃ লাহিড়ী মহাশয় চাকরকে একবার ডাকিলেন। ভৃত্য "যাই" বলিয়া উত্তর দিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আসিল না। রামতনু বাবু পুনরায় তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন, উত্তর আসিল "এই যাইতেছি", কিন্তু চাকরটি তথাপি তাঁহার কার্য্য করিবার জন্য উপস্থিত হইল না। সমাগত বন্ধুগণমধ্যে একটি ভদ্রলোক ইহাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বারে বারে লাহিড়ী মহাশয় ডাকিতেছেন, তথাপি ভৃত্যটি আসিল না দেখিয়া তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া

বলিয়া উঠিলেন, "মহাশয়, আপনার চাকরটা ত ভারি বেয়াদব দেখিতেছি।" লাহিড়ী মহাশয় ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "কেন, কেন ?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "আপনি এতবার ডাকিতেছেন, চাকরটা তবু আসিল না। আমার চাকর হ'লে আমি ঘা কতক দিয়ে দি, তা যাই বলেন।" ঋষিপ্রতিম লাহিড়ী মহাশয় ধীরে ধীরে অতি মধুরবচনে বুঝাইয়া বলিলেন, "দেখুন, ও না আসাতে আমার বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই ; তবে বৃথা কেন মন খারাপ করিব ? ওকে গালাগালি দিলে আমার কি লাভ হইবে, মাঝে থেকে মনটা খারাপ হইয়া যাইবে। সংসারে সকল কাজের ভিতরে, সকল দুঃখ-দুর্দ্দশা-ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকিয়াও যিনি মন ভাল রাখিতে পারেন, তিনিই সাধু। একেবারে সাধু না হ'তে পারি, যতটা পারি, তাহাই লাভ।" আগন্তুক ভদ্রলোকটি বিশেষ অপ্রতিভ হইলেন। বাস্তবিক, লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের ঘটনাসমূহ পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয়, তাঁহার সমগ্র শক্তি এবং চেষ্টা তিনি সাধুত্ব-লাভের জন্যই নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের এক অতি প্রধান বিশেষত্ব ঈশ্বরের মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস এবং ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগ। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা ছিল, ভগবান যাহা করেন,

সমস্তই মঙ্গলের জন্য। তিনি কখনও ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেন না। সকল ইচ্ছার যিনি মূল, সকল কর্ম্ম যাঁহার চরণে সার্থকতা লাভ করে, চরাচর যাঁহার ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত, সেই ইচ্ছাময়ের উপর নির্ভর করিয়া তিনি কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতেন। লোকের নিন্দা বা গঞ্জনা, পুরস্কার বা প্রশংসা তাঁহাকে কর্ত্তব্যপথ হইতে রেখামাত্র বিচলিত করিতে পারিত না। সংসারে দুঃখ কষ্ট অনেককেই সহিতে হয়, কিন্তু গিরিশৃঙ্গের ন্যায় অটল অচলভাবে দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধদিকে তাকাইয়া যিনি সমস্ত ঝঞ্ঝাবাত নীরবে মস্তকোপরি সহ্য করিতে পারেন, তিনিই মহাপুরুষ। লাহিড়ী মহাশয় জীবনে বহু পরীক্ষায় পতিত হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই বীরের ন্যায় জয়লাভ করিয়াছেন। ভগবানের প্রতি স্থিরবিশ্বাসে অক্ষতসম্মানে কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নির্ম্মল এবং পবিত্র জীবনের সংস্রবে যিনি একবার আসিয়াছেন, তিনিই তাঁহার সাধুতার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইয়াছেন।

লাহিড়ী মহাশয় বুঝিয়াছিলেন, ধর্ম্ম জীবনে এবং সাধনে, তর্কে বা মতে তাহার অধিষ্ঠান নহে। তিনি কোন প্রচলিত ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। রামতনু বাবু জীবনের প্রতি কার্য্যই ঈশ্বরের কার্য্য

বলিয়া মনে করিতেন। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান, মুসলমান সমস্ত জাতির মধ্যেই তাঁহার বহু অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন। তিনি কৃষ্ণনগর হইতে কলিকাতা আসিয়া কখনও কোন হিন্দু, আবার কখনও কোন খৃষ্টান বন্ধুর অতিথি হইতেন। যাঁহার আলয়ে অবস্থান করিতেন, তাঁহার গৃহে আনন্দোৎসব আরম্ভ হইত।

বঙ্গের প্রতিভাশালী নাট্যকার রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর যখন কর্ম্মোপলক্ষে কৃষ্ণনগর ছিলেন, তখন লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। অল্পদিনেই রামতনু বাবু কবিবর দীনবন্ধুর এমন ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার রচিত "সুরধুনী কাব্যে" লাহিড়ী মহাশয় সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

পরম ধার্ম্মিকবর এক মহাশয়,
সত্যবিমণ্ডিত তাঁর কোমল হৃদয়।
সারল্যের পুত্তলিকা, পরহিতে রত,
সুখ দুঃখ সমজ্ঞান ঋষিদের মত।
জিতেন্দ্রিয়, বিজ্ঞতম, বিশুদ্ধ বিশেষ,
রসনায় বিরাজিত ধর্ম্ম-উপদেশ।
একদিন তাঁর কাছে করিলে যাপন,
দশদিন ভাল থাকে দুর্ব্বিনীত মন।
বিদ্যাবিতরণে তিনি সদা হরষিত,
তাঁর নাম রামতনু সকলে বিদিত।

একদিন যাঁহার সাহচর্য্যে যাপন করিলে দুর্ব্বিনীত মন দশদিন ভাল থাকে, মানুষের মনের উপর এমন নৈতিক প্রভাব যিনি বিস্তার করিতে পারেন, তিনি মহাপুরুষ।

বাল্যজীবন এবং শিক্ষাবস্থা।

১২১৯ সালের চৈত্রমাসে (১৮১৩ খৃঃ) বারুইহুদা গ্রামে মাতুলালয়ে রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্ম হয়। বারুইহুদা কৃষ্ণনগর হইতে বহুদূরে অবস্থিত নহে, সুতরাং বালক ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই শুভসংবাদ লইয়া মাতামহ রাজবাটীর দেওয়ান রাধাকান্ত রায় মহাশয়ের নিকট লোক ছুটিল। রামতনুর পিতা রামকৃষ্ণ লাহিড়ী দেওয়ান মহাশয়ের কন্যা জগদ্ধাত্রী দেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন।

রামতনুর জন্মকালে পিতা রামকৃষ্ণ জমিদারী-বিভাগে কর্ম্ম করিতেন। রামকৃষ্ণ নিতান্ত সরলপ্রাণ এবং ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি যে সামান্য বেতন পাইতেন, তদ্দারা সংসারের অস্বচ্ছলতা দূর না হইলেও, তিনি কখনও অন্যায়রূপে কপর্দ্দক গ্রহণ করিতে স্বীকৃত ছিলেন না। সুতরাং নিতান্ত কষ্টে তাঁহার দিন অতিবাহিত হইত। রামকৃষ্ণ সরলমনে প্রসন্নচিত্তে সংসারের কাজ করিয়া যাইতেন, ফলাফল যাঁহার হাতে তিনি যাহা জুটাইতেন,

প্রীতমনে তাহাতেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। পিতা রামকৃষ্ণ ও মাতা জগদ্ধাত্রী দেবীর মনের বলের বহুকথা প্রচলিত আছে। জ্যেষ্ঠপুত্র মুমূর্ষু কেশবচন্দ্র গঙ্গাযাত্রা-কালে পিতার পদধূলিপ্রার্থী হন। রামকৃষ্ণ সেকালের বিগতস্পৃহ ঋষিদের মত প্রশান্তচিত্তে স্বর্গগামী পুত্রকে পদধূলির সহিত প্রাণের আশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেন। কেশবচন্দ্র আত্মীয় ও স্বজনগণের নিকট শেষবিদায় লইয়া ভাগীরথীসলিলে দেহত্যাগ করিতে চলিলেন। বাহকগণ পাল্কী উঠাইয়া নবদ্বীপাভিমুখে চলিল, সমাগত পুরুষ ও রমণীগণ অনেকেই কাঁদিতে লাগিলেন, কিন্তু সাধু স্থিরধী মহাপুরুষ রামকৃষ্ণ অটল রহিলেন। তাঁহার সৌম্য, প্রশান্তগম্ভীর বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় আভা প্রকটিত হইয়া উঠিল। এ দৃশ্য যে দেখিল সেই মুগ্ধ হইল, যে শুনিল সেই অশ্চর্য্যান্বিত হইল।

জগদ্ধাত্রীর পিতৃকুল সদাচারপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ ও পরোপকারী বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। পিতার একমাত্র কন্যা, তিন ভ্রাতার অগ্রজা জগদ্ধাত্রী রূপে গুণে গৃহের শ্রীস্বরূপা ছিলেন। তাঁহার পিতার বহু ধনসম্পত্তি থাকিলেও তিনি গরীব শ্বশুরগৃহেই বাস করিতেন। তৎকালে কুলীন জামাতৃগণ প্রায়ই শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতেন। সুতরাং ইচ্ছা করিলে জগদ্ধাত্রী পিতৃগৃহে

সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির রমণী ছিলেন না। পতির সম্মানকে তিনি বড় মুল্যবান মনে করিতেন এবং সাংসারিক বহু কষ্টের মধ্যে পতিগৃহেই বাস করিতেন। একদিন জগদ্ধাত্রীর পিতৃগৃহের একজন পরিচারিকা তাঁহাকে দেখিতে আইসে। দেওয়ানজীর আদরের কন্যা, যাঁহার ক্ষণিকসুখের জন্য পিতামাতা ব্যতিব্যস্ত হইতেন, যাঁহার বিন্দুমাত্র কষ্টের কারণ উপস্থিত হইলে তাঁহারা আহার নিদ্রা ভুলিয়া তৎপ্রতিকারে প্রবৃত্ত হইতেন, রায় মহাশয়ের সেই প্রযত্ন-পালিতা সুখলালিতা কন্যা 'ধান ভানিতেছেন' দেখিয়া দাসীটি বড় দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে তেজস্বিনী জগদ্ধাত্রী বলিলেন, "তুমি মাকে গিয়া বলিও, আমি এখানে খুব সুখে আছি। আমার কোন দুঃখ নাই। আমি খুব কাজ ভালবাসি।"

পিতামাতার ছয়টি সন্তানের পর, বিশেষতঃ কয়েকটি অকালে গত হইলে, রামতনু ভূমিষ্ঠ হন, সুতরাং তাঁহার ভাগ্যে কিছু অধিক আদর ও যত্ন লাভ ঘটিয়াছিল। কেশবচন্দ্র, শ্রীপ্রসাদ, রামতনু ও কালীচরণ, এই চারি ভ্রাতা উত্তরকালে যশস্বী হইয়া পিতামাতার আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিলেন।

"প্রাপ্তে তু পঞ্চমে বর্ষে বিদ্যারম্ভঞ্চ কারয়েৎ" এই

মনুবাক্যের নিয়মে পঞ্চম বৎসরে রামতনুর হাতে খড়ি হইল। স্বগ্রামস্থ দেবীপ্রসাদ চৌধুরী মহাশয়ের গৃহে এক পাঠশালা ছিল, সেইস্থানে বালকের পাঠারম্ভ হইল। অন্যান্য বালকগণের ন্যায় রামতনু কখনও কখনও গুরু মহাশয়ের প্রহারের ভয়ে পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু তিনি বরাবরই মনোযোগী ও শ্রমশীল ছাত্র ছিলেন। বালকের বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল আর পিতা রামকৃষ্ণ তাহার ভবিষ্যৎ ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। সে সময়ে কৃষ্ণনগর-সমাজের অবস্থা অতি ভয়ানক ছিল। যে সকল গুণে মানুষের মনুষ্যত্ব, তৎকালে কৃষ্ণনগর-সমাজে তাহার বিলক্ষণ অভাব ছিল; তাই রামকৃষ্ণ পুত্রের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। এমন সময়ে আশার একটি ক্ষীণরশ্মি রামকৃষ্ণের নেত্রপথে পতিত হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র কেশবচন্দ্র তখন আলিপুর জজ আদালতে কর্ম্ম করিতেন। পিতা রামতনুকে কেশবের বাসায় প্রেরণ করিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। কেশবচন্দ্র পিতামাতার আগ্রহাতিশয় দর্শনে দ্বাদশবৎসরবয়স্ক রামতনুকে নিজ-বাসায় লইয়া গেলেন।

কেশবচন্দ্র ভ্রাতাকে তাঁহার চেতলার বাসায় আনিয়া তাহার শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে ব্যগ্র হইলেন। প্রথমে কোন সুযোগ উপস্থিত হইল না। নিজে অবসর সময়ে

প্রাতে ও সন্ধ্যায় অল্প অল্প ইংরাজী ও পার্শী শিখাইতে লাগিলেন। কিন্তু রামতনুকে উত্তমরূপে ইংরাজী শিক্ষা-দিবার তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইল। তৎকালে লোক-হিতৈষী ডেভিড হেয়ারের স্কুল ভিন্ন ইংরাজী শিক্ষা করিবার অন্য কোন স্কুল ছিল না। কেশবচন্দ্র অনেক চেষ্টাতেও ভ্রাতাকে হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে পারিলেন না।

এই মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের চরিত অতি বিচিত্র। স্বয়ং সামান্য ঘড়িওয়ালা হইয়া, এবং অধিক বিদ্যা না শিক্ষা করিয়াও, তিনি মহাপ্রাণতার জন্য যে সকল মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, প্রভূত অর্থশালী এবং বিদ্বান্ ব্যাক্তিরও তাহা করা দুরূহ। ১৭৭৫ খৃঃ স্কট্ল্যাণ্ডদেশে এই মহাত্মার জন্ম হয়। পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি ঘড়ির ব্যবসায় লইয়া এদেশে আগমন করেন। সেকালে বড়লোক ভিন্ন অন্য কেহ ঘড়ি ব্যবহার করিতে পারিত না, এবং ঘড়িও এখনকার মত এত সুলভ ছিল না। যে সকল ব্যক্তি কার্য্য-প্রয়োজনে তাঁহার দোকানে গমন করিতেন, হেয়ার তাঁহাদের সহিত বঙ্গের উন্নতি বিষয়ক কথাবার্ত্তা কহিতে ভালবাসিতেন। ক্রমে তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল যে ইংরাজীশিক্ষার প্রচলন না হইলে এদেশের উন্নতির সম্ভাবনা নাই। অতঃপর মহাত্মা রাজা রামমোহন

রায়ের সহিত তাঁহার পরিচয় ও মিত্রতা হয়। এই বন্ধুত্বের ফলে হেয়ার অল্পদিন পরে ব্যবসায় বিক্রয় করিয়া আপনার যথাসর্ব্বস্ব এদেশীয়গণের উন্নতিকল্পে নিয়োজিত করেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থলে মহাত্মা হেয়ারের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

কেশবচন্দ্র যখন কনিষ্ঠের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে একান্ত উৎসুক সেই সময়ে কালীশঙ্কর মৈত্র নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া আসিলেন। কালীশঙ্করের আত্মীয় গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার হেয়ারের এক স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন এবং তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। কথা হইল, কেশবচন্দ্র কালীশঙ্করকে কর্ম্মলাভ বিষয়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন, তৎপ্রতিদান-স্বরূপ তিনি আত্মীয় গৌরমোহনকে ধরিয়া রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করাইয়া দিবেন। গৌরমোহন এ প্রস্তাবে আনন্দের সহিত সম্মত হইলেন, কিন্তু কার্য্য-কালে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না। বহু চেষ্টা করিয়াও রামতনুকে হেয়ারের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিতে সমর্থ হইলেন না। নির্দ্দিষ্টসংখ্যক অবৈতনিক ছাত্রের স্থান পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, হেয়ার কিছুতেই আর নূতন ছাত্র লইতে সম্মত হইলেন না।

গৌরমোহন হেয়ারের প্রকৃতি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তিনি রামতনুকে অনেক রকমে বুঝাইয়া, অনেক আশা ভরসা দিয়া, হেয়ারের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে কিছুদিন ছুটিতে পরামর্শ দিলেন। তৎকালে গরীব বালকগণ অবৈতনিক ছাত্র-রূপে ভর্ত্তি হইবার জন্য হেয়ারকে বড় উত্যক্ত করিত। হেয়ার যখন স্কুল পরিদর্শন করিবার জন্য বাহির হইতেন, অনেক ছাত্র তাঁহার পাল্কীর উভয় পার্শ্বে ছুটিত। এইরূপে বালক রামতনুকেও অনেকদিন হেয়ারের পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াইতে হইয়াছিল। লেখাপড়া শিখিয়া মানুষ হইবার ইচ্ছা রামতনুর মনে বাল্যকাল হইতেই ছিল, নচেৎ পরের কথায় কেহ দুই মাস এত কষ্ট করিয়া, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া কল্পিত সুখের সন্ধানে ছুটে না। অবশেষে হেয়ার বালকের আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা দেখিয়া প্রীত হইয়া তাহাকে আপনার স্কুলে 'ফ্রিছাত্র' রূপে গ্রহণ করিলেন। সেইদিন অন্য একটি বালকও হেয়ারের স্কুলে প্রবেশ করিলেন, ইনি পরবর্ত্তিকালপ্রসিদ্ধ রাজা দিগম্বর মিত্র।

স্কুলে ভর্ত্তি হইলে পড়িবার ত একটা ব্যবস্থা হইল, কিন্তু থাকিবার স্থানের বড় অসুবিধা হইতে লাগিল। রামতনু কিছুদিন পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের বাসায় থাকিতেন। কিন্তু সে স্থানের সংসর্গ এবং বিদ্যা-

লঙ্কারের নিজের চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা শুনিয়া কেশবচন্দ্র ভীত হইয়া ভ্রাতাকে শ্যামপুকুরে আত্মীয় রামকান্ত খাঁ মহাশয়ের বাসায় রাখিয়া দিলেন। এই নূতন বাসায় আসিয়া বালক রামতনুর সকল অসুবিধা দূর হইল; এখানে সকলেই রামতনুকে ভালবাসিতেন। পরন্তু, এই স্থানে এক সুবিধাও জুটিল। তাঁহার সহাধ্যায়ী বালক দিগম্বর মিত্র শ্যামপুকুরে মাতুলালয়ে অবস্থিতি করিতেন। রামতনু প্রায়ই দিগম্বরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন; ক্রমে তাঁহার মাতার সহিত রামতনুর পরিচয় হয়। দিগম্বরের জননী তাঁহাকে স্বীয় পুত্রের ন্যায় আদর, যত্ন ও স্নেহ করিতেন। লাহিড়ী মহাশয় চিরকাল তাঁহার সস্নেহ ব্যবহারের কথা কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিয়াছেন।

১৮২৮ খৃঃ রামতনু হেয়ারের স্কুল হইতে হিন্দু কলেজে আসিলেন। তৎকালে স্কুল সোসাইটীর স্কুল হইতে পারদর্শী ও উৎকৃষ্ট ছাত্রগণ উচ্চশিক্ষা-লাভার্থ হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হইতেন। ইহাঁদের মধ্যে দরিদ্র ছাত্রগণের বেতন স্কুল সোসাইটী দিতেন। রামতনু এইরূপে অবৈতনিক ছাত্র হইয়া কলেজে প্রবেশ করিলেন। দিগম্বর মিত্রও সেই সময়ে আসিলেন। তাঁহারা চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। কলেজে যে সকল সহাধ্যায়ীর

সহিত মিলিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয় পরে অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই ঐ সময়ে হিন্দু কলেজের সুবিখ্যাত যুবক-শিক্ষক ডিরোজিওর ছাত্র ছিলেন।

কলেজে প্রবিষ্ট হইয়া রামতনু শ্যামপুকুরের বাসা পরিত্যাগ করিয়া পাথুরিয়াঘাটায় তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ঠাকুর-দাস লাহিড়ী মহাশয়ের গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। লেখাপড়ার প্রতি তাঁহার প্রথম হইতেই যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। প্রথমশ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া রামতনু ১৬৲ মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন, এবং এই সামান্য টাকা কয়টির উপর নির্ভর করিয়াই কনিষ্ঠদ্বয়কে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। কেশবচন্দ্র আর সাহায্য করিতে পারিতেন না, সুতরাং এই টাকাতেই তিন ভ্রাতাকে কোনরূপে কলিকাতায় অবস্থানের ব্যয় সঙ্কুলান করিতে হইত। এই সময় তাঁহার একবার খুব কঠিন পীড়া হয়; বন্ধুগণ ও মহাত্মা হেয়ারের চেষ্টায় ও চিকিৎসায় রামতনু সেবার কিছুদিন ভুগিয়া আরোগ্যলাভ করেন।

মধ্যজীবন।

শিক্ষকতা ও সমাজসংস্কার।

১৮৩৩ খৃঃ রামতনু হিন্দুকলেজের পড়া শেষ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে ঐ কলেজে এক শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। তৎকালে হিন্দুকলেজের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ বিনা ক্লেশে গবর্ণমেণ্টের অধীনে বড় বড় কার্য্য পাইতেন। এ যুগের অতি লোভনীয় ডেপুটীগিরি তাঁহাদের অনায়াসলভ্য ছিল। রামতনু বাবুর ভাল ছাত্র বলিয়া কলেজে নাম ছিল, সুতরাং চেষ্টা করিলে গবর্ণমেণ্টের যে কোনও বিভাগে একটা ভাল কাজ তিনি পাইতেন। কিন্তু অর্থ বা সমৃদ্ধিতে তাঁহার কখনও মন ছিল না। জাঁকজমক ও বিলাসিতা তিনি একেবারেই ভালবাসিতেন না। দেশে উত্তম শিক্ষকের একান্ত অভাব দেখিয়া, তিনি সাধ্যানুসারে তাহার প্রতীকারে যত্নবান্ হইলেন, এবং স্বয়ং ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের পথ পরিহার করিয়া চিরজীবনের জন্য শিক্ষকের পবিত্র ব্রত গ্রহণ করিলেন।

বাস্তবিক শিক্ষকগণ দেশের যেরূপ উপকার করিতে সমর্থ, অন্য কাহারও দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে। কুম্ভকার যেরূপ কর্দ্দম দ্বারা মনোভিরাম দেবদেবীর মূর্ত্তি গঠিত করে, সুশিক্ষক তেমনই বালকগণের সুকোমল অন্তঃকরণে সুশিক্ষা, নীতি ও ধর্ম্মের প্রভাব বিস্তীর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে নরদেবতারূপে গঠিত করিতে পারেন। সুশিক্ষক বিদ্যার্থিগণের মানসনয়নের সম্মুখে কৃতী পুরুষ-দিগের সার্থক জীবনের কল্যাণকর ঘটনাবলী আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন, ছাত্র সম্প্রদায়ের অনুচিকীর্ষু মন আশায়, আকাঙ্ক্ষায় ও আগ্রহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে; তাহারা সর্ব্বপ্রযত্নে তদ্রূপ হইতে চেষ্টিত হয়। বক্তৃতা দ্বারা বা শুধু আন্দোলনে দেশ প্রকম্পিত করিয়া যে ফলের আশা করা যায় না, শিক্ষক অনায়াসে তদপেক্ষা বহুগুণ ফল উৎপন্ন করিতে পারেন। অক্লান্তকর্ম্মা ও স্বার্থচিন্তাশূন্য শিক্ষক-গণের সাধনার ফলে আধুনিক জার্ম্মাণির এরূপ উন্নতি হইয়াছে। জার্ম্মাণগণ জ্ঞানে, শৌর্য্যে ও সভ্যতায় এক্ষণে কত উন্নত! পুরাকালের সক্রেটিস্ ও আধুনিক যুগের আরনল্ড শিক্ষাদানকার্য্যে চিরজীবন ব্যয়িত করিয়া গিয়াছেন; তাঁহাদের জীবন-দীপ কবে নির্ব্বাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের জীবনের মহত্ত্বের প্রভাব আজিও প্রত্যেক ছাত্রকেই অনুপ্রাণিত করিতেছে।

রামতনু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। তিনি দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মসুখ-বিসর্জ্জনে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তাই তিনি বহুবিধ লোভনীয় চাকরী উপেক্ষা করিয়া শিক্ষকের অর্থশূন্য কষ্টময় বৃত্তি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছিলেন।

আজকাল বঙ্গদেশে যাঁহার অন্য কোনও দিকে চাকরীর সুবিধা না হয়, তিনি শিক্ষক হইয়া থাকেন। এফ্ এ বা বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ যখন ত্রিশঙ্কুর ন্যায় আইনের আকাশে অবস্থিত হন, তখন শিক্ষকতাই তাঁহাদের একমাত্র গতি হয়। নবোদ্ভিন্নপক্ষ পক্ষী যেমন নীড়ের উপর বসিয়া চারি দিকে লোলুপদৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তেমনি এই সকল শিক্ষকও এক চাকুরীতে বসিয়াই চারি দিকে অন্য চাকরীর সন্ধান করিতে থাকেন। এক্ষণে শিক্ষক নিযুক্তি-কালে দুই বৎসরের প্রতিশ্রুতি লিখিয়া লইতে হয়! শিক্ষকতা ক্রমে ক্রমে কি শোচনীয় দশাতেই উপনীত হইয়াছে!

মাসিক ত্রিশ টাকা মাত্র সম্বল করিয়া তিন ভ্রাতা একত্র থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন আশ্রয়ার্থী যে কেহ আসিত, লাহিড়ী মহাশয় তাহাকেই আশ্রয় দিতেন। তিনি এমনি মিতব্যয়ী ছিলেন যে, ঐ স্বল্পসংখ্যক মুদ্রা কয়েকটি হইতে আপনাদের খরচ বাদে কিছু কিছু পিতামাতাকে পাঠাইতেন,

এবং বিপন্ন ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদিগের জন্যও কিছু ব্যয় করিতেন। এই কথা শুনিয়া আজিকালি অনেকেই বিস্ময় প্রকাশ করিবেন, কিন্তু ইহা প্রকৃত কথা। এই সভ্যতার যুগে বহুবিধ অনাবশ্যক বিলাসোপকরণের গুরুভারে বাঙ্গালী প্রপীড়িত। এক্ষণে চারি দিকেই কেবল "অভাব অভাব" ধ্বনি। বাঙ্গালী আর পরের জন্য চিন্তা করিবার অবকাশ পায় না। জীবনসংগ্রাম এমন কঠোর হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার সমগ্র শক্তি ও চেষ্টা নিজের উদরপূরণেই সম্যক ব্যয়িত হইয়া যায়। বাঙ্গালী ছোট বড় সকলেই সমানরূপ দায়গ্রস্ত। তৎকালে এক জন কৃতী হইলে গ্রামের নিরন্ন দশজন তাঁহার দ্বারা প্রতিপালিত হইত। লাহিড়ী মহাশয় ত্রিশ টাকা বেতন সম্বল করিয়া যত লোকের অন্নের সংস্থান করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে শত মুদ্রা মাসিক আয়েও তাহা করা সম্ভবপর নহে।

এই সময়ে তাঁহার গৃহে যাঁহারা থাকিতেন, লাহিড়ী-মহাশয় প্রত্যেকের তত্ত্বাবধান করিতেন। প্রত্যেক ব্যক্তির সুখ ও সুবিধার জন্য তিনি ব্যস্ত হইতেন। তাঁহার ভ্রাতা কালীচরণ তখন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন করেন। একবার পরীক্ষার অব্যবহিত পূর্ব্বে তাঁহার চক্ষুর পীড়া হয়। ডাক্তারগণ পড়িতে একবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। কালীচরণ বড়ই ক্ষুণ্ণ ও দুঃখিত হইলেন।

সম্মুখেই পরীক্ষা, তাঁহার মন নিতান্ত দমিয়া গেল। তদ্দর্শনে লাহিড়ী মহাশয় স্বয়ং সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাকালে নিকটে বসিয়া পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা, অধ্যায়ের পর অধ্যায় এবং পুস্তকের পর পুস্তক বারংবার পাঠ করিয়া ভ্রাতাকে শুনাইতে লাগিলেন। মেধাবী কালী-চরণ তাহাতেই পরীক্ষায় সুন্দররূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিয়া-ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় চিরকাল সহোদরদিগকে প্রাণের অধিক ভালবাসিতেন।

নব্য-বঙ্গের দীক্ষাগুরু হেন্‌রী ভিভিয়ান ডিরোজিওর পদপ্রান্তে শিক্ষার্থিরূপে যাঁহাদের উপবেশন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল, উত্তরকালে তাঁহারা প্রায় সকলেই মান্যগণ্য হইয়াছেন। তাঁহাদের মনের বল অসাধারণ ছিল। তাঁহারা যাহা ভাল বলিয়া বুঝিতেন, সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহার অনুষ্ঠান করিতে চেষ্টিত হইতেন। অভ্যাস ও সংস্কার দ্বারা তাঁহারা আপনাদের যুক্তি-পরিচালিত কর্ম্মের বেগকে প্রতিহত হইতে দিতেন না। যন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় কুপ্রথার বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্ববিষয়ে চালিত হইতে তাঁহারা কিছুতেই স্বীকৃত ছিলেন না। যুক্তি ও বিবেচনা দ্বারা কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে, ডিরোজিওর এই শিক্ষা তাঁহারা চিরজীবন স্মরণ রাখিয়া-ছিলেন। কখনও কখনও ইহার অত্যধিক অনুসরণের ফলে

ইঁহারা রেখা হইতে কিঞ্চিৎ ভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেন। কিন্তু ইহাঁদের এক বিশেষ গুণ ছিল যে, ইহাঁরা কায়মনোবাক্যে কর্ম্ম করিতেন। ইহাঁরা বুঝিয়াছিলেন যে, গতানুগতিক হইলে আর চলিবে না; ঊর্ণনাভের ন্যায় জগৎকে দূরে রাখিয়া স্বনির্ম্মিত নিয়ম ও বিধান তন্তুর উপর অবস্থিত হইয়া মুদিতনেত্রে সুখ বা উন্নতির কল্পনা করিয়া কোনও ফল নাই। তাঁহাদের দৃঢ় প্রতীতি হইয়াছিল যে, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে এদেশবাসীর দশা ক্রমেই অধিকতর শোচনীয় হইয়া উঠিবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নত, মনুষ্যত্বের মহিমায় মণ্ডিত অন্যান্য জাতির অভ্যুদয়-কাহিনী শুনিয়া শুনিয়া তাঁহারা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর ভিতরে আর আপনাদিগকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিলেন না। প্রভাত রবির লোহিতোজ্জ্বল রশ্মিজাল যেরূপ প্রথমে পর্ব্বত-শীর্ষে পতিত হইয়া শৃঙ্গাবলীকে সুবর্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত করে, এবং ক্রমে ঊর্দ্ধগামী সূর্য্যের কিরণমালায় জগৎ আলোকময় হইয়া উঠে, তেমনি কোনও নূতন আলোক যখন জাতি-বিশেষের উপর পতিত হয়, তখন প্রথমে তাহা সেই জাতির শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণের উন্নতমনে প্রতিফলিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মন আলোকিত করে। নবীনালোক-রঞ্জিত-হৃদয় ডিরোজিওর ছাত্রগণ "কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা"র বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম

আরম্ভ করিলেন। ইহাঁদের বাড়াবাড়িতে বিরক্ত হইয়া হিন্দু-সমাজের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ 'হিন্দুকলেজ' হইতে ডিরোজিওকে পদচ্যুত করাইলেন। ডিরোজিওকে কাজেই কলেজ ছাড়িতে হইল, কিন্তু তিনি তাঁহার কতিপয় ছাত্রের মনে যে চিহ্ন রাখিয়া গেলেন, বাহিরের শত চেষ্টাতেও তাহা অন্তর্হিত হইল না। এই যুবকদলের মধ্যে কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় ও লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ইহাঁরা এক অতি অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে পরস্পরে আবদ্ধ ছিলেন, এবং সে বন্ধন চিরজীবন সুখে রক্ষা করিয়া গিয়াছেন।

১৮৪২খৃঃ ১লা জুন তারিখে ওলাউঠা রোগে মহামতি ডেভিড্ হেয়ার পরলোক গমন করিলেন। রামতনু হেয়ারকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। হেয়ারের মৃত্যুতে তাঁহার প্রাণে বড় আঘাত লাগিল। যে হেয়ার নানারূপে রামতনুর সুখপ্রয়াসী ছিলেন, তিনি পীড়িত হইলে যিনি শয্যা-পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন নাই, যিনি তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, মান ও সুখসমৃদ্ধির মূল কারণ, সেই পরমোপকারী মানববন্ধু হেয়ার চলিয়া গেলেন। রামতনু বড়ই শোক পাইলেন। শেষ জীবনে হেয়ারের নাম করিতে করিতে তাঁহার চক্ষু সজল হইত। যতদিন তাঁহার দেহে সামর্থ্য

ছিল, যত দিন তিনি একটুকুও চলিয়া বেড়াইতে পারিতেন, ততদিন প্রতিবৎসর ১লা জুন গোলদীঘীর দক্ষিণপার্শ্বে হেয়ারের সমাধিক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে লোকান্তরিত মহাত্মার সদ্‌গুণরাশি স্মরণ করিতেন।

অতঃপর লাহিড়ী পরিবারে নানা দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাঁহাদিগকে বড়ই পীড়িত করিতে লাগিল। কনিষ্ঠ রাধাবিলাসের মৃত্যুর কিয়দ্দিন পরেই কেশবচন্দ্র পরলোক গমন করিলেন। রামতনু কেশবকে পিতৃতুল্য শ্রদ্ধা করিতেন; যিনি লেখাপড়া শিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহার বিয়োগে রামতনু বড় কাতর হইলেন।

কুলীনের সন্তান রামতনু খুব অল্প বয়সে বিবাহ করেন। অল্পদিন পরে প্রথমা পত্নীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহ করেন। উভয় বিবাহেই তাঁহার সাংসারিক কোনরূপ সুখভোগ হয় নাই। দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যুর পর হাবড়া জিলার অন্তঃপাতী সাঁতরাগাছি গ্রামের কৃষ্ণকিশোর চৌধুরীর কন্যা গঙ্গামণি দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। ইনিই চিরজীবন লাহিড়ী মহাশয়ের সেবা করিয়াছিলেন।

ইহার পর জননী জগদ্ধাত্রী-রূপিণী জগদ্ধাত্রী দেবীর বিষম পীড়া হইল। যে মাতৃদেবীর শ্রীচরণযুগল কেশবচন্দ্র পুষ্পচন্দনে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, যাঁহার উপস্থিতি গৃহে গৃহে বিমল আনন্দ বিকীর্ণ করিত, স্নেহ,

ভালবাসা ও প্রীতির আধার সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী মাতা যখন মৃত্যুশয্যায় শয়ান হইলেন, তখন রামতনু উন্মত্তের ন্যায় মাতৃসেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার আহার নিদ্রা রহিত হইল। দিবারাত্রি জননীর শয্যাপার্শ্বে যাপন করিতেন; প্রাণপণ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইতে বদ্ধপরিকর হইলেন। কিন্তু মানুষের চেষ্টা কবে সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের নিয়ম লঙ্ঘন করিতে পরিয়াছে? কাল পূর্ণ হইয়াছিল, জননী মরধাম পরিত্যাগ করিয়া চিরানন্দ লোকে প্রস্থান করিলেন। রামতনু মাতৃশোকে চারি দিক অন্ধকার দেখিলেন। কিন্তু সময় বড় সুচিকিৎসক, কালে সব সহ্য হইয়া যায়। কাল ধীরে ধীরে পদ্মহস্ত বুলাইয়া গভীর বেদনার চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করিয়া ফেলে। কালে রামতনুরও শোকবেগ প্রশমিত হইল।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ বঙ্গে শিক্ষা-বিস্তারের ইতিহাসের এক অতি স্মরণীয় বৎসর। এই শুভ বৎসরে বঙ্গদেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে শিক্ষার উন্নতির কল্পে গবর্ণমেণ্ট এক লক্ষ মুদ্রা মঞ্জুর করেন। কোন্ ভাষায় সাধারণ শিক্ষা প্রচলিত হইবে, ইহা লইয়া শিক্ষাসমিতির সভ্যগণের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হয়। কেহ বলিতে লাগিলেন, ভারতের প্রাচীন শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, বিদ্যালয়াদি স্থাপন পূর্ব্বক

সংস্কৃত ও পারশীতে পুনরায় শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করা হউক, আবার অনেকে ইংরাজি শিক্ষার অনুকূলে মত ব্যক্ত করিলেন। এইরূপ গোলযোগে বহুদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। অবশেষে বিলাত হইতে নবাগত ব্যবস্থা-সচিব লর্ড মেকলে মহোদয়ের সহিত একমত হইয়া, ভারতের তদানীন্তন গবর্ণর জেনারল মহানুভব লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহোদয় ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে এ দেশে ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত ঐ এক লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিতে আদেশ প্রদান করিলেন। যদিও প্রাচীনের দল ইহাতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নবীন দল এই শুভসংবাদে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। ইংরাজী-শিক্ষা-প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গে এক নূতন বাতাস বহিল। বহু শতাব্দীর জড়তান্ধকারের ভিতরে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক পড়িয়া দেশে যেন নবীন জীবনের সঞ্চার করিল। শত শত বৎসরের কর্ম্মহীন, উদ্যমহীন, নিশ্চেষ্ট সমাজদেহে যেন জীবনীশক্তির স্ফুরণ হইল। কলিকাতা সহরে ইংরাজী-শিক্ষার জন্য একটি দুইটি করিয়া কলেজ স্থাপিত হইতে লাগিল।

এই সময়ের এক অতি স্মরণীয় ঘটনা কৃষ্ণনগর কলেজের প্রতিষ্ঠা। নব্যবঙ্গের অন্যতম শিক্ষাগুরু সুপ্রসিদ্ধ কাপ্তেন ডি. এল্. রিচার্ডসন্ মহোদয় প্রথমতঃ এই



স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী, মধ্যবয়সে

২৯ পৃষ্ঠ

নব-প্রতিষ্ঠিত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন, এবং রামতনু লাহিড়ী মহাশয় ইহার স্কুলবিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতা হইতে কৃষ্ণনগর গমন করেন। কৃষ্ণনগর গমনকালে, তাঁহার কলিকাতাস্থিত বন্ধুগণ তাঁহাদের গভীর প্রীতির চিহ্নস্বরূপ, আপনারা চাঁদা তুলিয়া অতি সুদৃশ্য করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের একখানি তৈলচিত্র প্রস্তুত করান এবং তাঁহাকে একটি ঘড়ি উপহার প্রদান করেন। লাহিড়ী মহাশয় অমূল্য রত্নস্বরূপ ঐ ঘড়িটি চিরদিন বহুযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। ছবিখানি প্রথমে কৃষ্ণনগর রামতনু বাবুর ভ্রাতা ডাঃ কালীচরণ লাহিড়ীর ডিস্‌পেনসেরি গৃহে ছিল, তথা হইতে জরাজীর্ণ অবস্থায় ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় আনিয়া পরিষ্কার করাইয়া নিজের হেরিসন রোডস্থ বাড়ীতে রাখিয়াছেন। তাহার একটি প্রতিরূপ প্রদত্ত হইল।

কৃষ্ণনগরস্থিত বন্ধুগণ রামতনু বাবুকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে কৃষ্ণনগরে হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে বেশ দলাদলি চলিতেছিল। নদীয়ারাজ শ্রীশচন্দ্র স্বয়ং ব্রাহ্মগণের পক্ষাবলম্বন করিয়া রাজপ্রাসাদে ব্রাহ্ম-সমাজের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রামতনু চিরদিনই কোনও বিশেষ দলে আপনাকে আবদ্ধ রাখেন

নাই। যে দিকে সত্য, যে দিকে ন্যায় ও যুক্তি, সেই দিকেই রামতনু থাকিতেন। সম্প্রদায় বা ধর্ম্মবিশেষকে অযথা আক্রমণ করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। তৎকালে শ্রেষ্ঠব্যক্তিমাত্রই রামতনুকে চিনিতেন, এবং শ্রদ্ধা করিতেন। কৃষ্ণনগরে আগমন করিয়া রামতনু বাবু নূতন মত সকল প্রচার করিতে লাগিলেন। মহাত্মা ডেভিড্ হেয়ার, ডিরোজিও ও রাজা রামমোহন রায় প্রভৃতি মনীষিগণের নিকট তিনি যাহা শিখিয়াছিলেন, রামতনু সেই সকল উদার মত কৃষ্ণনগরবাসিগণের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন; প্রবল সত্যানুরাগ, চিন্তা ও বাক্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, এবং অত্যধিক জ্ঞানস্পৃহা, তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তাঁহার জ্ঞানলাভাকাঙ্ক্ষা চিরজীবন সমভাবে প্রবল ছিল। বালকের ন্যায় সরলতা নৈসর্গিক বিনয়ের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার চরিত্র বড়ই মধুর করিয়াছিল। ক্রোধ, অহঙ্কার ও অবিনয় তাঁহার নির্ম্মল হৃদয়ে একদিনের জন্যও কলঙ্করেখাপাত করিতে সমর্থ হয় নাই। এই সমস্ত গুণে রামতনু বাবু কৃষ্ণনগর সমাজে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

রামতনু বাবুর কৃষ্ণনগর গমনের কিছুদিন পর হইতেই তথায় নানাবিধ আন্দোলন উপস্থিত হইল। যুবকদল সভাসমিতি করিয়া পথে ঘাটে কেবল সমাজ-সংস্কারের

কথা বলিতে লাগিলেন। হিন্দুকলেজের ছাত্রগণ সকলেই ডিরোজিও প্রভৃতি শিক্ষকগণের শিক্ষায় চিন্তা ও কার্য্য বিষয়ে একান্ত স্বাধীনভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা সমাজসংস্কারের নামে অনেক সময়ে সমাজের প্রতি অযথা আক্রমণ করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাঁহারা শিখিয়াছিলেন, "যাহাই পুরাতন তাহাই মন্দ, তাহাই পরিত্যাজ্য, আর যাহাই নূতন তাহাই উত্তম, তাহাই কল্যাণকর এবং সর্ব্বথা অবলম্বনীয়।" প্রাচীন সমাজের প্রতি সহানুভূতির অভাব হেতু তাঁহারা শীঘ্রই সীমা অতিক্রম করিয়া গেলেন, এবং জনসাধারণের নিকট তাঁহাদের সংস্কারক-মূর্ত্তি অপেক্ষা সংহারকের মূর্ত্তিই অধিকতর স্পষ্টরূপে প্রকটিত হইল। এই সকল কারণে কৃষ্ণনগরে উদারমতাবলম্বী যুবকদল বিশেষ অপ্রিয় হইয়া উঠিলেন।

"ক্ষিতীশবংশাবলী"র প্রণেতা স্বর্গীয় দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—কলিকাতা হইতে একবার বাবু কালীকৃষ্ণ মিত্র কৃষ্ণনগরে গমন করিলে তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য আনন্দবাগে বনভোজনের আয়োজন হয়। তাহাতে রামতনু বাবু, তাঁহার ভ্রাতৃদ্বয়, দেওয়ান মহাশয়, বামাচরণ চৌধুরী প্রভৃতি কতিপয় যুবক অগ্রণী ছিলেন। বন-ভোজনের পরদিবস এক কুচক্রী ব্যক্তি প্রচার করিয়া

দিল যে, আনন্দবাগে বনভোজনে একটি গোবৎস হত্যা করা হইয়াছে। অপর এক ব্যক্তি এই ভয়ানক মিথ্যা কথাকে শাখাপল্লবিত করিয়া সাক্ষ্য দিল যে, সে দূর হইতে বৃক্ষশাখায় লম্বমান গোবৎসের দেহ দেখিয়া আসিয়াছে। রৌদ্রশুষ্ক অরণ্যে বৃক্ষসঙ্ঘর্ষজাত অনলকণা যেমন মুহূর্ত্তমধ্যে বনভূমি পরিব্যাপ্ত করে, তেমনি যুবক-দলের প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন কৃষ্ণনগরবাসীর মধ্যে এক মুহূর্ত্তেই কথাটা ছড়াইয়া পড়িল। কেহ ইহার সত্যমিথ্যা অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন না, কিন্তু অতি ভয়ানক গোল-যোগ লাগিয়া গেল। যেখানে সেখানে ঐ গোবৎস-হত্যার কথা। বলা বাহুল্য, বনভোজনে নিহত ছাগদেহই দুষ্ট লোকের কল্পনার সাহায্যে এতটা আন্দোলনের কারণ হইয়াছিল। এই ঘটনায় এবং বিধবা-বিবাহ-সংক্রান্ত আন্দোলনে ও হাঙ্গামায় লাহিড়ী মহাশয়ের কৃষ্ণনগরে থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। তিনি চেষ্টা করিয়া ১৮৫১ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে বদ্‌লী হইলেন। এইবার ১৫০৲ বেতনে হেড্‌মাষ্টার হইয়া বর্দ্ধমান গমন করিলেন।

বঙ্গদেশের প্রায় প্রত্যেক জিলার প্রধান নগরে গবর্ণ-মেণ্টের একটি করিয়া এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। এই সকল স্কুলের শিক্ষক মহাশয়গণ ইচ্ছা করিলে অনেক সময় এক স্থান হইতে অন্যত্র বদ্‌লী হইতে পারিতেন। রামতনু

লাহিড়ী মহাশয় বহু গবর্ণমেণ্ট স্কুলে কার্য্য করিয়াছেন। কস্তূরী যেমন যে স্থানে থাকে, সেই স্থানেই লোককে সুগন্ধে মুগ্ধ করে, তেমনি লাহিড়ী মহাশয়ও যেখানে যাইতেন, সেইখানেই তাঁহার যশের বিমল সৌরভে সকলে আমোদিত হইত। বর্দ্ধমান স্কুলে গমন করিলে, স্কুল ছুটীর পর কৌতুহলী ছাত্রেরা দেখিতে আসিল কেমন হেড্‌মাষ্টার আসিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী শিক্ষকগণ কঠিন শারীরিক শাস্তি দিয়া ছাত্রগণের মনে এক বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া দিয়াছিলেন। ছেলেরা জানালার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। লাহিড়ী মহাশয়ের সৌম্য শান্তমূর্ত্তি দেখিয়া কাহারও প্রাণে লেশমাত্রও ভীতির ছায়া পড়িল না। কিয়ৎক্ষণ পরে তাহারা ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিল; অল্পে অল্পে একটি মুসলমান ছাত্র অগ্রসর হইয়া লাহিড়ী মহাশয়ের চাপকান ধরিয়া একটু আকর্ষণ করিল। তিনি বালকটির দিকে চাহিয়া স্মিতহাস্য করিলেন, কিছুই বলিলেন না। বালক বাড়ী যাইয়া গল্প করিল যে, স্কুলে এবার মুসলমান হেড্ মাষ্টার আসিয়াছেন। তাহার পিতা কহিলেন, "কই, তাহা ত আমরা শুনি নাই।" বালক অমনি বলিয়া উঠিল, "পূর্ব্বে যাঁহারা আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদের কাছেও যাইতে পারি নাই। আজ আমি নূতন মাষ্টার মহাশয়কে

ছুঁইয়াছিলাম, তিনি কেবল হাসিলেন, কিছুই বলিলেন না।” পিতা তখন বুঝাইয়া দিলেন, হেড্‌মাষ্টার মহাশয় হিন্দু হইলেও কাহাকেও অশ্রদ্ধা করেন না। মানুষ যখন বিদ্যায় ও জ্ঞানে বড় হয়, তখন তাহার ক্ষুদ্রত্ব চলিয়া যায়, সকলেই তখন তাহার চক্ষে তুল্যরূপ প্রতিভাত হয়। তাহাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য। এই বালকটি লাহিড়ী মহাশয়ের নিকট সর্ব্বদা যাতায়াত করিত।

একদিন দুই ঘটিকার সময় স্কুল ছুটি হইয়াছে। গ্রীষ্মকাল, বড় রৌদ্র উঠিয়াছে। দারুণ সূর্য্যের তাপে গাছ পালা শুষ্ক ও মৃতপ্রায়। চারি দিক্ ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। লাহিড়ী মহাশয় যে পাল্কী করিয়া স্কুলে যাতায়াত করিতেন, বাহকেরা তাহা লইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইলেন না। অমনি ছাত্রেরা দৌড়িল, দেখিল, এক বৃক্ষতলে বেশ ছায়া পড়িয়াছে, তথায় পাল্কী রাখিয়া বাহকগণ নিশ্চিন্তমনে অকাতরে ঘুমাইতেছে। বালকগণ ডাকিতে যাইবে, এমন সময় লাহিড়ী মহাশয় আসিয়া তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। একটি বালক বলিল, “কেন ডাক্‌ব না? আপনি দাঁড়াইয়া থাকিবেন, আর ওরা ঘুমুবে? আমি এক ছাতার খোঁচায় তুলে দিচ্ছি।” লাহিড়ী মহাশয় যেন অন্তরে ব্যথা পাইলেন, বলিলেন, “কর কি, কর কি? এমন কাজ কর্‌তে আছে? ওরা কত পরিশ্রম

করে, একটু ঘুমিয়েছে, থাক্ না। আমি ততক্ষণ তোমাদের সঙ্গে গল্প করি।” কথোপকথনে প্রায় অৰ্দ্ধঘণ্টা অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন বাহকগণের নিদ্রাভঙ্গ হইল। লাহিড়ী মহাশয়কে ঐরূপে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া তাহারা বিশেষ অপ্রতিভ হইল; এক মিনিটে সব ঠিকঠাক করিয়া লইল। পাল্কীতে বসিয়া লাহিড়ী মহাশয় একটু হাসিয়া বলিলেন, “তোমাদের বড় ঘুম।”

একদিন স্কুলে লাহিড়ী মহাশয় পড়াইতেছেন এমন সময়ে সংবাদ আসিল যে তাঁহার শিশু পুত্রটি গুরুতর আঘাত পাইয়াছে। গৃহে যাইয়া শুনিলেন যে ভৃত্য তাহাকে আহ্লাদ করিয়া হাতের উপর নাচাইতে নাচাইতে একবার ধরিতে না পারায় ছেলেটি মাটিতে পড়িয়া গুরুতররূপে আহত হইয়াছে। গৃহিণী তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কাঁদিতেছেন। তদ্দর্শনে রামতনু বাবু চাকরটিকে কহিলেন, “বাপু হে, তুমি এখন অন্যত্র গমন কর। যদিও তোমার কোন দোষ নাই, তবুও তোমাকে দেখিলেই ওই ছেলের কষ্টের কথা মনে হয় আর মনটা খারাপ হয়। তোমার অন্য স্থানে যাওয়াই ভাল।” ভৃত্য চলিয়া গেল।

আর একদিন লাহিড়ী মহাশয় আতা কিনিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহার এক ছাত্র বলিলেন, “আমি কিনিয়া

দিতেছি; আপনি আতা কিনিতে গেলে ঠকিয়া আসিবেন।" লাহিড়ী মহাশয় কহিলেন, "আমি নিজেই যাইব। তুমি আতাওয়ালাকে ঠকাইয়া বেশী আতা আনিবে, তাহা আমি ইচ্ছা করি না।" তাঁহার ছাত্রটি তখন সহাস্যে বলিলেন, "আমি ঠিকই আনিয়া দিব, আপনি গেলে ঠকিবেন; আপনি পয়সায় দুইটি আনিবেন, আমি চারিটা আনিতে পারিব।" তাঁহার বহু পীড়াপীড়িতেও রামতনু বাবু তাঁহার নিকট পয়সা দিলেন না। স্বয়ং বাজারে যাইয়া দুইটা করিয়া আতা কিনিয়া আনিলেন। দেখিয়া সকলে হাসিতে লাগিল, তদ্দর্শনে তিনি অকুণ্ঠিত-চিত্তে বলিলেন, "কাহাকেও ঠকাইয়া বা কাহারও নিকট হইতে বল-পূর্ব্বক কপর্দ্দকও গ্রহণ করিতে আমি ইচ্ছা করি না।" * সর্ব্বকার্য্যেই লাহিড়ী মহাশয়ের যথেষ্ট বিবেচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

এই গল্প চতুষ্টয় আমরা স্বর্গীয় লাহিড়ী মহাশয়ের কৃতী ছাত্র শোভনচরিত্র শ্রীযুক্ত নবাব আবদুল জব্বর খাঁ বাহাদুর, সি, আই, ই, মহোদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। নবাব বাহাদুর ভক্তিপূর্ণ চিত্তে রামতনু বাবুর অধ্যাপনা প্রণালী ও ছাত্রদিগের সহিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করিয়া কহিলেন, "অমন খাঁটি মানুষ আর দেখিলাম না। অমন মানুষ কি আর হয়?"

রামতনু বাবু যাহা করিতেন সর্ব্বান্তঃকরণে করিতেন। মনে একরূপ মুখে অন্যরূপ, ইহা তাঁহার কখনও ছিল না। তিনি যাহা বিশ্বাস করিতেন, তদনুসারে কার্য্য করিতে যত্নশীল হইতেন। তাঁহার মাতৃশ্রাদ্ধের দিবস একটি বালক তাঁহাকে বিদ্রূপ করিল। বালক হাসিতে হাসিতে কথাটা বলিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু কথাটা লাহিড়ী মহাশয়ের প্রাণের ভিতরে আঘাত করিয়া বহু অশান্তির সৃষ্টি করিল। উপবীত রাখিবেন কি না ভাবিতে লাগিলেন। সেই সময়ে আর এক ঘটনা ঘটিল। সেই বৎসর পূজার ছুটিতে তিনি রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অভিলাষী হইয়া কতিপয় বন্ধুসহ নৌকাযোগে গাজীপুর যাত্রা করেন। পথে নৌকার মুসলমান মাঝিদের রন্ধন করা অন্ন-ব্যঞ্জন আহার করিয়া একটী ভদ্রলোক সহাস্যে বলিলেন, "আমরা মুসলমান মাঝিদের হাতে সকলেই খাইতেছি, আবার পৈতাটিও বেশ রাখিয়াছি!" রামতনু বাবুর অন্তরে এতদিন ঘোর সংগ্রাম চলিতেছিল। আস্থা-শূন্য হইয়া কোন বিষয়ে বিশ্বাসের ভান তিনি করিতে জানিতেন না। এই সামান্য একটি কথায় তিনি চিরদিনের মত উপবীত পরিত্যাগ করিলেন। হিন্দুসমাজ তাঁহার এই কার্য্য কি ভাবে গ্রহণ করিবেন, আত্মীয় ও স্বজনবর্গ তাঁহার কি

শাস্তিবিধান করিবেন, হিন্দুসমাজ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার কি গতি হইবে, এসকল তাঁহার চিন্তা করিবার অবসর হইল না। তিনি মানসিক যন্ত্রণায় অধীর হইয়া ইহজন্মের মত উপবীত দূরে নিক্ষেপ করিলেন। এই ব্যাপার লইয়া কি বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তাঁহার ধোপা, নাপিত বন্ধ হইল। দাস, দাসী তাঁহাকে ছাড়িয়া পলায়ন করিল। তিনি যেন সমাজের চক্ষে অতি ঘৃণ্য জীব হইয়া পড়িলেন। এই সময়ে তাঁহার পত্নীর ক্লেশের পরিসীমা রহিল না। সাংসারিক কার্য্যসমূহে এই মহিলাকে সাহায্য করিবার স্বামী ভিন্ন আর কেহই ছিলেন না। লাহিড়ী মহাশয় প্রশান্তচিত্তে সব নিন্দা, গঞ্জনা ও নির্য্যাতন নীরবে সহ্য করিয়া সপত্নীক গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। লোকের কথায় পত্নী অনেক সময় আকুলা হইয়া পড়িতেন, আবার দেবকল্প স্বামীর মধুর উপদেশে সান্ত্বনা-লাভ করিতেন। এই ঘটনায় কৃষ্ণনগরে বৃদ্ধপিতা নিষ্ঠা-বান্ হিন্দু রামকৃষ্ণের মনঃকষ্টের সীমা রহিল না। তিনি রামতনুকে কিছুই বলিলেন না, নীরবে সমস্ত সহ্য করিলেন।

এক বৎসর বর্দ্ধমান অবস্থানের পর রামতনু বাবু উত্তরপাড়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার হইয়া আসিলেন। এখানে

তিনি চারি বৎসর কাল যাপন করেন। উত্তরপাড়া অবস্থান কালে তাঁহার কলিকাতাবাসী বন্ধুগণ নানা উপায়ে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। ইহাঁদের মধ্যে প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি কখনও পাচক, কখনও চাকর, কখনও বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী জোগাইতে লাগিলেন। এই সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয় সহোদর ভ্রাতার ন্যায়, বরাবর রামতনু বাবুর কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করিয়াছেন। অনেকে লাহিড়ী মহাশয়ের কষ্ট দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় উপবীত গ্রহণের জন্য পরামর্শ দিতেন। অনেকে অনেক যুক্তির অবতারণা করিতেন; কিন্তু তিনি কিছুতেই আর উপবীত গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। বলিতেন, "আমি যাহা করিয়াছি, তাহা করিয়াছি; আমার মত পরিবর্ত্তিত হইবে না।"

বর্দ্ধমান পরিত্যাগ কালে রামতনু বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবকুমারের বয়ঃক্রম দুই বৎসর মাত্র ছিল। উত্তর-পাড়াতে তাঁহার লীলাবতী ও ইন্দুমতী নামে দুই কন্যার জন্ম হয়।

উত্তরপাড়া হইতে রামতনু বাবু বারাসতে বদলি হইলেন। বারাসত কলিকাতা হইতে বহুদূরে অবস্থিত

নহে। এই স্থান হইতে লাহিড়ী মহাশয় প্রায়ই বন্ধুগণের সাহচর্য্যলাভের জন্য কলিকাতা আসিতেন। দেড় বৎসর পরে তিনি বারাসত হইতে কৃষ্ণনগর বদ্‌লি হইলেন। তথায় কয়েকমাস মাত্র অবস্থানের পরই কলিকাতার দক্ষিণ দিকে রসাপাগ্‌লা নামক স্থানে টিপু সুলতানের বংশধরদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্ট স্কুলে শিক্ষক হইয়া আসিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের বাসভূমি কৃষ্ণনগরকে লাহিড়ী মহাশয় বড় ভালবাসিতেন। কৃষ্ণনগরের প্রতিধূলিকণা ও প্রতিবৃক্ষ-শাখা যেন তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দন করিত। যদিও কৃষ্ণনগর পরিত্যাগ করিতে তাঁহার বিশেষ কষ্টবোধ হইল, তথাপি বন্ধুপ্রিয় রামতনু বাবু, রসায় আসিলে কলিকাতা-স্থিত বন্ধুবর্গকে দেখিবার ও তাঁহাদের সাহচর্য্যলাভের সুবিধা হইবে মনে করিয়া, প্রীত হইলেন।

পুনরায় কলিকাতা আগমন করিয়া রামতনু বাবু বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালার ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালার ইতিহাসে কতিপয় স্মরণীয় বৎসর। লোমহর্ষণকর সিপাহী-বিদ্রোহ প্রশমনের সঙ্গে সঙ্গেই অশান্তি ও উদ্বেগ দূর হইয়া গেল; ইংলণ্ডেশ্বরী পুণ্যশ্লোকা মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে বঙ্গের প্রজাকুলের উপর

নীলকরগণের নিদারুণ অত্যাচার চলিতেছিল; সেই ভীষণ কাহিনী বিবৃত করিয়া প্রজাবন্ধু হরিশচন্দ্রের "হিন্দু পেট্রিয়ট্" ভীমবলে তৎপ্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইল, বাঙ্গালা ভাষায় "সোমপ্রকাশে"র অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠালাভ ঘটিল, ক্রমে দেশে সংবাদপত্র প্রচারের দ্বার খুলিয়া গেল। নব্য-বঙ্গের সাহিত্য-গগনে এই সময়ে উজ্জ্বল নক্ষত্রপুঞ্জের আবির্ভাব হইল,—কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তকে পুরোবর্ত্তী করিয়া কাব্যাকাশে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত সমুদিত হইলেন, নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" 'নীলকর-বিষধরগণের' বিষদন্ত চিরদিনের জন্য উৎপাটিত করিয়া দিল, বিদ্যাসাগরের প্রাঞ্জল ও প্রসাদগুণযুক্ত ভাষার উপর বঙ্কিমচন্দ্রের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিমল রশ্মি পতিত হইয়া তাহাকে অপরূপ সুষমায় মণ্ডিত করিল, তাঁহার তূলিকার বিচিত্র বর্ণসম্পাতে এবং অসাধারণ কাব্যকৌশলে বাঙ্গালা সাহিত্য অপূর্ব্ব শ্রী ও গৌরবে উদ্ভাসিত হইল। অতঃপর মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন আবির্ভূত হইয়া একেশ্বরবাদ প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবের গভীরতায়, ভাষার ললিত ছটায় ও তাঁহার বক্তৃতার মোহিনী শক্তিতে যুবকগণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সকল দিকেই আশা ও উদ্যমের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইল। নব্যবঙ্গের উদীয়মান

কবি, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক প্রভৃতির প্রচারিত পুস্তকাদি পাঠে এদেশবাসী আহ্লাদ-সাগরে মগ্ন হইল। বাঙ্গালা ভাষা যে একটা ভাষা, তাহা যে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে প্রাণে বিভিন্ন ভাবের আবির্ভাব করিতে সমর্থ, তাহা যে কবির প্রতিভা-সূত্রে গ্রথিত হইলে মেঘমন্দ্রে আকাশমণ্ডল প্রকম্পিত করিয়া পরক্ষণেই আবার বসন্তসমাগমহৃষ্ট কোকিলের ন্যায় মধুর ঝঙ্কারে প্রাণে সুধা-তরঙ্গ তুলিতে পারে, এ ধারণা কাহারও ছিল না; বাঙ্গালী বিস্মিত হইয়া দেখিল বাঙ্গালা ভাষা সংসারের সহস্র ঝঞ্ঝাটের মধ্যেও সুখী অসুখী, ধনী নির্ধন, সকলেরই প্রাণে শান্তিবিধান করিতে সমর্থ। আয়েসা, তিলোত্তমা ও কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি অপূর্ব্ব স্ত্রীচরিত্রের পরিচয় পাইয়া, এবং নবকুমার, ওসমান্ ও নবীনমাধব প্রভৃতি পুরুষশ্রেষ্ঠগণের চরিত্রমাহাত্ম্য দেখিয়া এদেশবাসী মুগ্ধ হইল। মধুসূদনের যে প্রতিভার ঐন্দ্রজালিক স্পর্শ মিত্রাক্ষরের কঠিন নিগড় হইতে বাঙ্গালা ভাষাকে মুক্ত করিয়া তাহাকে নবশক্তিসম্পন্ন করিল, তাহাই হর্ষবিহ্বল বঙ্গীয় পাঠকগণের নয়নের সম্মুখে বীরাঙ্গনা প্রমীলা ও বাসববিজয়ী মেঘনাদের আবির্ভাব করিয়া তাহাদিগকে বিস্ময়ে অভিভূত করিল। এই সকল কাব্য, নাটক ও উপন্যাস বাঙ্গালীকে জগতের চক্ষে উন্নত করিয়া দিল।

রসা হইতে বরিশাল ঘুরিয়া লাহিড়ী মহাশয় পুনরায় কৃষ্ণনগর আসিলেন। তিনি যেস্থানেই গিয়াছেন, অল্পসময় মধ্যেই তথায় লোক-প্রিয় হইয়াছেন। অধ্যাপনার প্রণালী, ছাত্রগণের প্রতি স্নেহপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি নানা কারণে ছাত্রগণ তাঁহার একান্ত অনুরক্ত ছিল। অধ্যাপনাকালে তিনি সংসার ভুলিয়া যাইতেন, অধ্যাপনার বিষয় ভিন্ন তাঁহার আর কিছুই মনে থাকিত না। ভাবাতিশয্যে তাঁহার মুখ-মণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিত। বিদ্যার্থিগণের কোমল হৃদয়ে সুশিক্ষার বীজের সহিত পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও ভগবদ্ভক্তির বীজও বপন করিতে তিনি সতত যত্ন করিতেন। বালকগণের অন্তঃকরণে সৎপ্রবৃত্তি জন্মানই তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ও লক্ষ্য ছিল। ছাত্র-দিগকে বলিতেন, "তোমাদের মনঃসিংহকে উত্তেজিত করিতে পারিলেই আমার কার্য্য সফল হয়।" তাঁহার কৃতিত্বের চিহ্নস্বরূপ উত্তরপাড়া কলেজে প্রস্তর-ফলক স্থাপিত হইয়াছে। সুশিক্ষার সহিত এমন করিয়া নীতি-বীজ বপন করিতে আর কাহাকেও দেখা যায় না।

রামতনু বাবু ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে কুড়ি বৎসর বয়সে কর্ম্মগ্রহণ করেন, এবং বত্রিশ বৎসর গবর্ণমেণ্টের অধীনে কার্য্য করিবার পর, ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বায়ান্ন বৎসর বয়সে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন। নভেম্বর মাসে তিনি

যখন পেন্সনের জন্য আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন, তখন কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গুণগ্রাহী অধ্যক্ষ মিঃ এলফ্রেড স্মিথ্ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট তাঁহার দরখাস্ত পাঠাইবার সময় তদুপরি যাহা লিখিয়াছিলেন, আজি কালি কোন শিক্ষকের বিদায়গ্রহণ কালে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীর তদ্রূপ বিশ্বাস এবং সম্মান লাভ করিবার সৌভাগ্য হয় কিনা বলিতে পারি না। মিঃ স্মিথ্ লিখিয়াছেন, "শিক্ষাবিভাগের কর্ম্মচারিগণের মধ্যে কেহই বাবু রামতনু লাহিড়ীর ন্যায় বিশ্বস্ততা, উৎসাহ এবং একাগ্রতার সহিত কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পাদন করেন নাই, অথবা কেহই তাঁহার ন্যায় পরিশ্রম এবং সফলতার সহিত ছাত্রগণের নৈতিক জীবনের উন্নতি-প্রয়াসী হন নাই।"*

---

* "Mr. Alfred Smith, Principal of the Krishnagar College, sent the application to the Director with the following remarks :—

"In parting with Babu Ramtanu Lahiri, I may be allowed to say that Government will lose the services of an educational officer than whom no one has discharged his public duties with greater fidelity, zeal and devotion, or has laboured more assiduously and successfully for the moral elevation of his pupils." "

Lethbridge's Life of Ramtanu Lahiri, p. 132.

রামতনু বাবুর শিক্ষাদান-প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহার সুযোগ্য ছাত্র অবসরপ্রাপ্ত একজিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার মান্যবর শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের লিখিত পত্র হইতে নিম্নে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল।

"আহারের পর মানসিক-চিন্তা অস্বাস্থ্যকর, এইজন্য ইস্কুল বসিলে ছাত্রদের প্রথমে হস্তলিপি লিখিবার নিয়ম করিয়াছিলেন; এই সঙ্গে বানান শুদ্ধির কার্য্যও হইত।

"আধ ঘণ্টা লেখার পর পড়া আরম্ভ হইত। পড়ার প্রথম অঙ্গ আবৃত্তি। যতক্ষণ না উচ্চারণশুদ্ধি ও যতিচ্ছেদ ঠিক হইত, ততক্ষণ আবৃত্তি করিতে হইত। তিনি নিজে বার বার আবৃত্তি করিয়া শিখাইতে ত্রুটি করিতেন না। পাঠের অনেক অংশ তাঁহার আবৃত্তিগুণে আমাদের বোধ-গম্য হইয়া যাইত। আবৃত্তির পর ব্যাখ্যা আরম্ভ হইত। শব্দের প্রতিশব্দ বলিলেই ব্যাখ্যা হয় না। প্রথমতঃ সহজ ভাষায় পাঠের অর্থ বলা হইত। তারপর প্রশ্ন দ্বারায় লেখকের ভাব ছাত্রদের হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতেন। তৎপরে পাঠ্য বিষয়ের আনুসঙ্গিক যাহা কিছু থাকিত, সমস্ত আলোচিত হইত।

"ছাত্রেরা যাহাতে আপন যত্নে শিখে, যাহাতে লেখা-পড়ার প্রতি তাহাদের রুচি জন্মে এবং যাহাতে শিক্ষার ফল তাহারা কার্য্যে পরিণত করিতে পারে, এই সকল

বিষয়ে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। বলিতেন 'তোমাদের মনঃসিংহকে উত্তেজিত করিতে পারিলে আমার কার্য্য সফল হয়।' পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত, ইংরাজ কবি বারণ্‌স্, কাউপার, টম্‌সন এবং ক্যাম্বেল হইতে কতকগুলি সুন্দর ও সরল কবিতা বাছিয়া আমাদের পড়াইতেন। মিল্‌টনের কোমাস্ হইতে অনেক অংশ পড়াইয়াছিলেন। ছাত্রেরা যাহাতে ইংরাজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করিতে পারে এ বিষয়ে তিনি বড় যত্নশীল ছিলেন। যখন তিনি কোন কবিতা আবৃত্তি করিতেন, তাঁহার মুখমণ্ডল আরক্ত হইত, এবং হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হইত। তাঁহার সঙ্গে আমাদেরও উৎসাহ বৃদ্ধি হইত। কতদিন বোধ হইত টিফিনের ঘণ্টা বড় শীঘ্র বাজিয়া গেল। ছাত্রদের চিত্ত আকর্ষণ করিবার তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল; যেন সকলের মন সূত্রে গাঁথিয়া আপনার হাতের ভিতর ধরিয়া রহিয়াছেন। আন্তরিক অকৃত্রিম স্নেহই এই শক্তির মূল।

"রামতনু বাবুর অধ্যাপনা শ্রেষ্ঠতম হইবার আর একটি কারণ ছিল। ছাত্রদের সঙ্গে সঙ্গে তিনি সর্ব্বদা নিজকে শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তিনি চিরজীবন ছাত্র ছিলেন। লোকে ধন মান লাভের নিমিত্ত যে প্রকার অধ্যবসায় ও আগ্রহ প্রকাশ করে, তিনি

জীবনের উৎকর্ষসাধন জন্য ততোধিক করিতেন। নিরন্তর এই উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য ছিল।"

রামতনু বাবুর উপবীত পরিত্যাগ করিবার সংবাদ শ্রবণ করিয়া, বৃদ্ধপিতা নিষ্ঠাবান্ হিন্দু রামকৃষ্ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। পুত্রের এই কার্য্য তাঁহাকে মর্ম্মাহত করিয়াছিল। তাহার পর যে কয় দিন তিনি জীবিত ছিলেন, নিরন্তর ভগবানের চিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে সাধু রামকৃষ্ণ ইষ্টদেবতার নাম জপ করিতে করিতে সজ্ঞানে দেহত্যাগ করেন।

পিতৃবিয়োগের দুই বৎসর পরে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ভাদ্রমাসে কলিকাতা সহরে রামতনু বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমারের জন্ম হয়। তাহার তিন বৎসর পরে ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের মাঘ মাসে কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে তাঁহার তৃতীয় পুত্র বসন্তকুমার জন্মগ্রহণ করেন।

শেষজীবন।

পারিবারিক দুর্ঘটনা ও স্বর্গারোহণ।

অবসর গ্রহণ করিয়া লাহিড়ী মহাশয় শারীরিক অসুস্থতার জন্য ভাগলপুর চলিয়া গেলেন। মনে করিয়াছিলেন বেহারের শুষ্কভূমিতে বাস করিলে স্বাস্থ্য ভাল থাকিবে, কিন্তু কয়েক মাস তথায় অবস্থানের পর যখন কোন উপকার উপলব্ধ হইল না, তখন পুনরায় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের অধিকাংশ সময় কৃষ্ণনগর ও কলিকাতায় ব্যয়িত হইয়াছে। যদিও তাঁহার শরীর এই সময়ে খুব ভাল ছিল না, তথাপি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও তিনি ত্রিশ বৎসর কাল জীবিত ছিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের দীর্ঘজীবনের মূলসূত্র তাঁহার নিয়মিত জীবন। অনিয়মিত কোন কার্য্য তাঁহার ছিল না। কি সুখে কি দুঃখে, কি সৌভাগ্যে কি দুর্দ্দশায়, কিছুতেই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিত না। অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে তিনি ভ্রমণে বহির্গত হইতেন। তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই, দুই একটি মাত্র পাখী প্রভাতী গাহিতে আরম্ভ

করিয়াছে, এমনি সময়ে তিনি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতেন, প্রাতঃকৃত্য শেষ করিয়া মৃদুস্বরে গাহিতেন, "মন সদা কর তাঁর উপাসনা।" যাঁহার অপার করুণায় রজনীর অন্ধকার অন্তর্হিত হইয়া দিবসের আলোক জগৎকে সজীবতা প্রদান করে, ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ছাতাটি লইয়া বহির্গত হইতেন। কোনও দিন পুত্র শরৎকুমারকে ডাকিয়া কহিতেন, "শরৎ, ওঠ, দেখ কেমন সুন্দর প্রভাত!"

সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিলে মন প্রশস্ত হয়, হৃদয় নির্ম্মল হয়। পূর্ব্বাকাশ অরুণ-রাগরঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে, নানাবর্ণচিত্রিত মেঘখণ্ড সকল ধীরে ধীরে কোন্ দেশে ভাসিয়া চলিয়াছে; সুখস্পর্শ সুশীতল প্রভাতবায়ু বৃক্ষপত্র ঈষদান্দোলিত করিয়া সদ্যঃ-প্রস্ফুটিত কুসুমরাশির সুরভি পরিমল চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ করিতেছে। মধুরকণ্ঠ বিহগকুল স্বরলহরীতে আকাশ-মণ্ডল প্লাবিত করিয়া গগনপথে উড়িয়া বেড়াইতেছে। সুপ্তবিশ্ব রজনীর অবসানে কর্ম্মক্লান্ত দেহে নববল লইয়া জাগিয়া উঠিতেছে। এ দৃশ্য কি সুন্দর! লাহিড়ী মহাশয় প্রকৃতির এই প্রভাতশোভা দেখিয়া সংসারের দুঃখকষ্ট ভুলিয়া যাইতেন। কেবল সৌন্দর্য্যের কথা নহে, মনে হয়, লাহিড়ী মহাশয় যে প্রায় নীরোগশরীরে

দীর্ঘজীবন যাপন করিয়া গিয়াছেন, এই প্রাতরুত্থানের অভ্যাস তাহার অন্যতম কারণ।

সহপাঠী ও বন্ধুগণের প্রতি লাহিড়ী মহাশয়ের বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সতীর্থগণকে যেরূপ ভক্তি করিতেন, আজিকালি ছাত্রগণ শিক্ষকগণকে তদ্রূপ ভক্তি করেন কি না সন্দেহ। এক্ষণে কেহ অপরের নিকট মস্তক অবনত করিতে স্বীকৃত নহে। সহাধ্যায়ী রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে রামতনু বাবু গুরুর ন্যায় ভক্তি করিতেন। তিনি যখন উত্তরপাড়া স্কুলের হেড্‌মাষ্টার, তখন একদিন একটি ভদ্রলোক তাঁহার পুত্রকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হন। কার্য্যের সুবিধা হইবে মনে করিয়া তিনি রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া আসিয়াছিলেন। রামতনুবাবু কৃষ্ণমোহনের কথা শুনিয়াই প্রথমে পত্রখানি মস্তকে রাখিলেন, বলিলেন, 'আমার গুরুর পত্র', তাহার পর পাঠ করিলেন। রসিককৃষ্ণ মল্লিক নামক আর এক জন বন্ধুকে তিনি অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। রসিককৃষ্ণ অনেক বিষয়ে তাঁহার আদর্শস্বরূপ ছিলেন।

স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের সহিত লাহিড়ী মহাশয় অতি দৃঢ় প্রণয়-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। তাঁহার

বন্ধুগণের মধ্যে বোধ হয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় তিনি আর কাহাকেও ভালবাসিতেন না। রামগোপালও লাহিড়ী মহাশয়কে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় মান্য ও ভক্তি করিতেন। রামতনু বাবুর গুণরাশির মধ্যে বন্ধু-প্রীতি তাঁহার একটি অননুকরণীয় গুণ ছিল। তিনি আপনার সুহৃদ্‌বর্গের প্রত্যেক কথাটি অভ্রান্ত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই স্বার্থচিন্তার দিনে বন্ধু, মিত্র, বা সখার কথা আর শুনিতে পাওয়া যায় না। দিমন ও পিথিয়াসের বন্ধু-প্রীতির অপূর্ব্ব কাহিনী এক্ষণে উপকথায় পরিণত হইয়াছে। মানুষ অপরের সুখের জন্য, অন্ততঃ দুঃখভারলাঘবের জন্য, প্রাণপণ করিতে পারে, এ কথা শুনিতেও সুখ।

একদিন রামতনু বাবুর স্ত্রী তাঁহাকে বলিলেন, "সকলেই নানারূপ অলঙ্কার পরে, আমার কিছুই নাই। কাহারও বাড়ীতে যেতে হ'লে এমন খালি গায়ে যাওয়া যায় না; তাহাতে পাঁচ জনে পাঁচ কথা বলে। আমাকে একজোড়া বালা গড়াইয়া দিতে হইবে।" লাহিড়ী মহাশয় দেখিলেন, কথাটা ঠিক; ভাবিয়া চিন্তিয়া বালাজোড়া গড়াইয়া দেওয়া উচিত মনে করিলেন। পরদিবস প্রিয় বন্ধু রামগোপালের বাড়ীতে যাইয়া কথাটা বলিয়া আসিলেন। তাঁহার স্বর্ণকার দ্বারা বালা তৈয়ার করাইয়া দিতে অনুরোধ করিলেন। রামগোপাল বাবু সপ্তাহ পরে

সুন্দর একজোড়া বালা নীলকাগজে মুড়িয়া পাঠাইয়া দিলেন। লাহিড়ী মহাশয়ের পত্নী সহর্ষে নূতন অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিলেন।

দুই তিন দিন পরে পাড়ার অন্যান্য রমণীগণ বালাটার ভিতরে গোলমাল আছে, এইরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। এক জন অবশেষে বলিয়া ফেলিলেন, "ইহা নিশ্চয়ই গিল্টিকরা পিতলের বালা!" লাহিড়ী মহাশয়ের স্ত্রী এই কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। যথাসময়ে এ সংবাদ রামতনু বাবুকে জানান হইল। তিনি উহা কাণেই তুলিলেন না;—"রামগোপাল দিয়াছেন, উহা কি কখনও পিতলের হইতে পারে?" গৃহিণীর সব আপত্তি, সব সন্দেহ "রামগোপাল যে দিয়াছেন," এই এক কথাতেই লাহিড়ী মহাশয় উড়াইয়া দিলেন।

কিছুদিন এইরূপে কাটিল। প্রতিবাসিনী মহিলাদের কথায় গৃহিণী আবার স্বামীকে ধরিলেন। লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও রামগোপাল বাবুর বাটীতে গমন করিলেন, এবং কথাপ্রসঙ্গে ধীরে ধীরে গহনার কথাটা পাড়িলেন। শুনিয়াই রামগোপাল উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। একটু মজা দেখিবার জন্য তাঁহারা ঐরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া সকলে অত্যন্ত হাসিতে লাগিলেন। সেই মুহূর্ত্তে সুগঠন স্বর্ণবলয় আনীত হইল। লাহিড়ী

মহাশয় গৃহে যাইয়া হাসিতে হাসিতে উহা স্ত্রীর করে অর্পণ করিলেন।

রামগোপাল বাবুর মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে বসিয়া লাহিড়ী মহাশয় বালকের ন্যায় কাঁদিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সম্মানার্থ যে সভা হয়, তাহাতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করেন, কিন্তু সেই সভাতে লাহিড়ী মহাশয়ের বক্তৃতা যেরূপ মর্ম্মস্পর্শিনী হইয়াছিল তদ্রূপ আর কাহারও হয় নাই।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে মেডিকেল কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ীর সহিত রামতনু বাবু তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা লীলাবতীর বিবাহ দিলেন। এই বিবাহ উপলক্ষে কলিকাতা হইতে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন প্রমুখ অনেক গণ্যমাণ্য ব্যক্তি কৃষ্ণনগরে গমন করেন। কৃষ্ণনগরের অনেক সদাশয় ভদ্রলোক রামতনু বাবুর কন্যার বিবাহে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া ব্যাপার নির্ব্বাহ করিয়া দিয়াছিলেন।

পর বৎসর লাহিড়ী মহাশয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক খাঁটুরা গোবরডাঙ্গার জমীদার-পুত্রগণের অভিভাবক নিযুক্ত হইয়া তথায় গমন করেন। তিনি কেবল তাঁহাদিগকে শিক্ষাদান করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না। গ্রামের অধিবাসিগণের সহিত সর্ব্বদা মিশিয়া সৎপ্রসঙ্গে কাল-

যাপন করিতেন। "যেরূপ লোক কখনও উপাসনায় যোগ দেন নাই, তাঁহার আহ্বানে এমন ব্যক্তিও সে সময়ে উপাসনায় যোগ দিয়াছেন।" তিনি নিজে উদ্যোগী হইয়া সকলের বাড়ীতে যাইয়া উদারভাবে মিশিয়া বিচ্ছিন্নভাবাপন্ন হিন্দু ও ব্রাহ্মগণের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া দিয়াছিলেন। ভগবানকে ডাকিতে হইবে, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের গুহ্যকথা তাঁহাকে নিবেদন করিতে হইবে, তাঁহার করুণার ভিখারী হইতে হইবে, ইহাতে দম্ভ, অভিমান বা দলাদলি তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। উপাসনা করিতে বসিয়া কখনও তিনি আবিষ্টের ন্যায় উঠিয়া ভাবাতিশয্যে বাহিরে পাদচারণা করিয়া বেড়াইতেন। যাঁহার ইঙ্গিতে অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডের উত্থান-পতন, যাঁহার রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত, কৃপা অনন্ত, সেই অনন্তস্বরূপ ভগবানের উপাসনায় বসিলে তাঁহার প্রাণের দ্বার খুলিয়া যাইত, তাঁহার গুণগান শ্রবণ করিলেই তিনি অশ্রুসংবরণ করিতে পারিতেন না। এক-দিন তাঁহার সহিত যিনি উপাসনা করিয়াছেন, তিনি সেই শুভমুহূর্ত্তের কথা চিরজীবন স্মরণ করিয়া রাখিয়াছেন।

একদিন একটি ভদ্রলোক এক জন সুগায়ককে রামতনু বাবুর নিকট আনয়ন করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় ভগবদ্-গুণগান অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বন্ধুগণ যখন আসিলেন,

তিনি তখন চা পান করিতেছিলেন। বন্ধুর নিকট তিনি সুগায়কের পরিচয় পাইয়া খুব আহ্লাদিত হইলেন, কহিলেন, "আমাকে একটি গান শুনাইতে হইবে।" লাহিড়ী মহাশয়ের কথা শেষ হইতে না হইতেই গায়ক মহাশয় মৃদুস্বরে সুর আবৃত্তি করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গুণ্‌গুণ্ শব্দ শুনিয়াই লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "মহাশয়, অনুগ্রহ করিয়া একটুকু অপেক্ষা করুন, আমি এখন ভগবানের নামকীর্ত্তন শুনিবার মত অবস্থাতে নাই।" তখন চায়ের পাত্রগুলি স্থানান্তরিত করা হইল। রামতনু বাবু গললগ্নীকৃতবসনে উপবেশন করিয়া বলিলেন, "এইবার গান করুন।" সঙ্গীত আরম্ভ হইল। ভগবানের নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ভক্তহৃদয় উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, ধীরে ধীরে বিন্দুর পর বিন্দু নয়নাশ্রু শ্বেতশ্মশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল, তাঁহার মুখ-মণ্ডলে স্বর্গীয় আভা প্রকটিত হইল। উপস্থিত সকলে এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বাস্তবিক, এই সাধুপুরুষের সহিত একদিন যাঁহার যাপন করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তিনি এ জীবনে আর তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের আষাঢ় মাসে কৃষ্ণনগরে লাহিড়ী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র বিনয়কুমারের জন্ম হয়। ইহার

কিয়দ্দিন পরেই উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলন উপস্থিত করেন। লাহিড়ী মহাশয় চিরদিন স্ত্রীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। বঙ্গীয় রমণীগণ মুর্খ হইয়া অন্তঃপুরে আবদ্ধ থাকিবেন, পৃথিবীর সহিত তাঁহাদের কোনও সংস্রব থাকিবে না, ইহা তিনি ভাল-বাসিতেন না। তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, আমাদের কন্যাগণকে যত্নপূর্ব্বক শিক্ষা দিতে হইবে, সর্ব্ববিষয়ে তাঁহাদিগকে উন্নত করিতে হইবে, নতুবা বাঙ্গালী-জাতি ক্রমে হীন হইতে হীনতর দশায় উপনীত হইবে; এবং সেই কারণেই তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। "হিন্দুমহিলা বিত্মালয়" স্থাপিত হইবামাত্র তিনি তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা ইন্দুমতীকে সেই স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

এইরূপে কয়েক বৎসর অতিবাহিত হইল। কৃষ্ণনগরে বাসকালে একদিন লাহিড়ী মহাশয় সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নবকুমারের যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে। নবকুমার মেডিকেল কলেজে পড়িতেন। পাঠ্যবিষয়ে কৃতী হইবার জন্য তিনি গুরুতর পরিশ্রম করিতেন। সেই অপরিমিত পরিশ্রমের ফলে তিনি দারুণ রোগে আক্রান্ত হইলেন।

আমাদের দেশে পরীক্ষার জন্য গুরুতর পরিশ্রম করা

ছাত্রগণের মধ্যে নিয়ম আছে। পরীক্ষা যতই নিকটবর্ত্তী হয়, তাঁহারা বহিঃসংসারের সহিত সম্বন্ধ ততই পরিত্যাগ করিতে থাকেন। এই মানবদেহ যে উপযুক্ত পরিশ্রম ও বিশ্রাম ভিন্ন চলিতে পারে না, তাহা ছাত্রগণ একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান। দিবারাত্রি পরীক্ষা-বিভীষিকা তাঁহাদের অন্তর অধিকৃত করিয়া থাকে, তাঁহারা এই এক বিষয় ভিন্ন বিষয়ান্তর আলোচনায় কোন সুখ প্রাপ্ত হন না। আহ্লাদ আমোদ তিরোহিত হয়, বন্ধুগণের সুখকর সংসর্গ সময়নষ্ট বোধে পরিত্যক্ত হয়, শরীর যাহাতে ভাল থাকিতে পারে সে চিন্তা একেবারেই থাকে না, সর্ব্ববিষয়েই প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘিত হয়। তাহার ফলে অনেকেরই শরীর অকালে অপটু হইয়া যায়। অনুক্ষণ পুস্তকের নিকট বসিয়া থাকিতে থাকিতে ইহাঁদের দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়, ক্রমে অগ্নিমান্দ্য, শিরোঘূর্ণন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য প্রভৃতি ক্ষীণদেহকে আক্রমণ করে। ছাত্রগণ সংসারে উচ্চস্থান লাভের প্রয়াসী হইয়া চিরজীবনের জন্য নিম্নে পড়িয়া যান, সুখে দীর্ঘজীবন অতিবাহিত করিবার আশায় পলে পলে জীবনীশক্তির ক্ষয় করেন, সমাজে বড় হইতে যাইয়া অকালে পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হন।

পরিশ্রম এবং বিশ্রাম এই দেহযন্ত্র-পরিচালনের মূল-মন্ত্র। উপযুক্ত বিশ্রাম ভিন্ন অল্পদিনেই দেহের কার্য্যকরী

শক্তি নষ্ট হইয়া যায়। বৃথা কালক্ষেপ না করিয়া সমস্ত বৎসর যথোপযুক্ত পরিশ্রম করিলে শেষে আর সময় হারাইয়া অনুশোচনা করিতে হয় না। নবকুমার দেহের মায়া পরিত্যাগ করিয়া কলেজে প্রশংসালাভের জন্য অত্যধিক পরিশ্রম করিতেন। তাহার অতি শোচনীয় পরিণাম হইল। তাঁহার যক্ষ্মারোগের লক্ষণ প্রকাশের সংবাদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতা আগমন করিলেন। স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ডাক্তার নর্ম্মাণ চিভার্সের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তাঁহার পুত্রপ্রতিম শিষ্য স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের বাসায় নবকুমারকে রাখিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল।

কিছুদিন কাটিয়া গেল। নবকুমারের পীড়ার কোনও উপশম হইল না। নবকুমার কৃষ্ণনগর গমন করিলেন; ইন্দুমতীও স্কুল পরিত্যাগ করিয়া ভ্রাতার শুশ্রূষার জন্য গৃহে চলিয়া গেলেন। নবকুমারের পীড়া ক্রমেই কঠিন হইতে লাগিল, যন্ত্রণাও ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। পশ্চিমের অনার্দ্র বায়ুতে ব্যাধির উপশম হইতে পারে আশা করিয়া সকলে নবকুমার ও ইন্দুমতীকে ভাগলপুরে প্রেরণ করিলেন। কিয়দ্দিন ভাগলপুরে অবস্থানের পর নবকুমার একটু ভাল হইলেন, এবং তথায় চিকিৎসা

ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের অন্তরে কথঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হইল।

ঐ বৎসর (১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ) নবেম্বর মাসে এক নিদারুণ টেলিগ্রাম পাইয়া লাহিড়ী পরিবার বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। রামতনু বাবু খবর পাইলেন, তাঁহার জামাতা ডাক্তার তারিণীচরণ ভাদুড়ীর মৃত্যু হইয়াছে। তারিণীচরণের বুদ্ধিমান ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া কলেজে নাম ছিল। তিনি পশ্চিমে কাশীপুর নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট ডিস্‌পেন্‌সারির ডাক্তার ছিলেন। কি কারণে তারিণীচরণ সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া নিজেই নিজের জীবনের অকাল-সমাপ্তি করিলেন, তাহা অবগত হওয়া গেল না। এই দারুণ দুর্ঘটনায় লাহিড়ী পরিবার শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। বিধবা লীলাবতী ছয় বৎসর বয়স্ক পুত্রটি লইয়া পিতার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে লাহিড়ী মহাশয় পীড়িত পুত্রকন্যা লইয়া বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। কিছুদিন ভাল থাকিয়াই নবকুমারের পীড়া পুনরায় গুরুতর আকার ধারণ করিল। তাঁহার রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া আত্মীয়বর্গ অত্যন্ত কাতর হইলেন। চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় যাহা সম্ভব, সকলই হইতে লাগিল। শুদ্ধশীলা ইন্দুমতী প্রাণপণ করিয়া ভ্রাতার

সেবায় মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সময়ে আহার নিদ্রা তিরোহিত হইল। সহোদরের শুশ্রূষার জন্য এই সেবাব্রতধারিণী মহিলা যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। কতদিন আহার করিতে বসিয়া ভ্রাতার কাতরোক্তি শুনিয়া উঠিয়া গিয়াছেন, কতদিন সিক্তবস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার সময় হয় নাই, তাহা গাত্রেই শুষ্ক হইয়াছে, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠাপূর্ণ চিত্তে রুগ্ন ভ্রাতার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া কত বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু কিছুতেই ভ্রাতার ক্রূর রোগের কোন প্রতীকার হইল না। এই অত্যাচার ইন্দুমতীর সহিল না, তিনি নিজে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইলেন। ইন্দুমতীর পীড়ার কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই নিতান্ত ভীত হইলেন। পীড়াও দেখিতে দেখিতে ভয়ানক বাড়িয়া উঠিল। তখন সকলকে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য আরাতে লইয়া যাওয়া হইল। তথায় কাহারও যন্ত্রণার লাঘব হইল না, বরং আর এক দুর্ঘটনা ঘটিল। লাহিড়ী মহাশয়ের ছোট কন্যাটী হঠাৎ জ্বররোগে প্রাণত্যাগ করিল। তৎপরে পরমবন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে সকলে ইন্দুমতীকে কৃষ্ণনগরে লইয়া আসিলেন।

ঐ বৎসর আগষ্টমাসে লাহিড়ী মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র বিনয়কুমার রক্তাতিসার রোগে যখন খুব পীড়িত, সেই

[illegible]

কাল প্রভাতে তোমার পত্র
পাইয়াছি কিন্তু কিছু অসুস্থ ছিলাম বলিয়া
[illegible] নীরব ছিলাম। তোমার [illegible]
[illegible] সম্পন্ন হইয়াছে তা
[illegible] পাইলাম। [illegible]
তুমি যেরূপ [illegible] পাইয়াছ এবং
[illegible] ইহারাই [illegible]
সাংসারিক শুভযোগ। এই শুভযোগ তোমার
ভাগ্যে প্রচুর পরিমাণে উপস্থিত হউক।

[illegible]

[illegible]

সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব সূচিত হইয়াছে। আমরা সেই পত্রখানি আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শ্রী শ্রীহরিঃ
শরণম্।

সাদরসম্ভাষণমাবেদনমিদম্

কল্য প্রাতে তোমার পত্র পাইয়াছি, কিন্তু কিছু অসুস্থ ছিলাম, এ জন্য কল্যই উত্তর লিখিতে পারি নাই। তোমার চতুর্থ পুত্রটি অতিসার রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, এই সংবাদে অতিশয় দুঃখিত হইলাম। আজকাল তুমি যেরূপ বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছ, এরূপ প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারই নাম সাংসারিক সুখভোগ। এই সুখভোগ তোমার ভাগ্যে প্রচুরপরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে।

বোড়ালের ঔষধ অতিসার রোগের মহৌষধ। ঐ ঔষধ সেবন করাইলে বিনয় রোগমুক্ত হইবেক, সন্দেহ নাই। বর্দ্ধমানের কবিরাজ মহাশয়কে পত্র লিখিতে

বিলম্ব করিবে না। তাঁহার ঔষধের ব্যয়ের জন্য তোমার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই।

হেম ভাল আছেন। এখানে আসিয়া তাঁহার বিলক্ষণ উপকার দর্শিয়াছে। কিন্তু তাঁহার পুত্র দুইটি ভাল নাই। জ্যেষ্ঠটির *জ্বর হইয়াছে, অদ্য অষ্টাহ হইল, তথাপি জ্বরের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। কনিষ্ঠটির কাশী হইয়াছে। আমার কনিষ্ঠ কন্যাটিও কাশী হইয়া অতিশয় কষ্টভোগ করিতেছে। এজন্য ২।৩ দিনের মধ্যে কলিকাতা যাওয়া মনঃস্থ করিতেছি। যদি যাওয়া হয়, তোমায় সংবাদ লিখিব। আমার নিজের বামহস্তে এরূপ বেদনা হইয়াছে যে, হস্তটি একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে, রাত্রিতে যাতনার একশেষ হয়। কল্য অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল, এ জন্য পত্র লিখিতে পারি নাই। আজ অপেক্ষাকৃত বেদনার অনেক লাঘব হইয়াছে। ইতি ২৯ আগষ্ট, ১৮৭৭

ভবদীয়স্য

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মণঃ

যেরূপ কাণ্ড উপস্থিত তাহাতে সহজ মানুষেরও অসুস্থ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। এ অবস্থায় নবকুমারের

* শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়।

পীড়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব অবস্থায় আছে, ইহাই পরম লাভ। আমার আশঙ্কা হইতেছে, উদ্বেগ ও দুর্ভাবনায় অভিভূত হইয়া নবকুমার হয় ত অধিক অসুস্থ হইবেন।

ইন্দুমতীর পীড়ার সংবাদ শুনিয়া আমার কন্যারা যারপরনাই বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হইয়াছেন।

শ্রীঈ—

বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ম্মাটাঁড় হইতে এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। এই একখানি পত্রে লাহিড়ী মহাশয়ের প্রতি তাঁহার গভীর ভালবাসা ও প্রাণের সহানুভূতি এবং তাঁহার চরিত্রের বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। এই পত্রখানি যখন লিখিত হয়, তখন নবকুমার ও ইন্দুমতী প্রভৃতি পীড়িত, কেহ তখনও মৃত্যুগ্রাসে পতিত হন নাই। তথাপি বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন, 'সাংসারিক সুখ-ভোগ তোমার ভাগ্যে প্রচুরপরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে।' তখনও পুত্রকন্যা কেহ লাহিড়ী মহাশয়কে পরিত্যাগ করিয়া যান নাই, তখনও আশার ক্ষীণরশ্মি বিদ্যুৎচমকের ন্যায় তাঁহার অন্তরাকাশে এক-একবার প্রকাশমান হইতেছিল, লাহিড়ী মহাশয় মনেও করিতে পারেন নাই যে, এতগুলি পুত্রকন্যার জীবনের অকালপরিসমাপ্তি

তাহাকে প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, তাই এক সঙ্গে অনেককে পীড়িত দেখিয়া দয়ার জলধি বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতনু বাবুর “সাংসারিক সুখের” এই মাত্রাকেই “প্রচুর” মনে করিতেছিলেন। তাঁহার কোমল অন্তঃকরণ বুঝি বন্ধুর ইহা অপেক্ষা অধিক দুর্দ্দশা বা কষ্ট কল্পনাও করিতে পারিত না। কিন্তু তিনি যদি ভবিষ্যতের যবনিকা উত্তোলন করিয়া দেখিতে সমর্থ হইতেন, তাহা হইলে দেখিয়া শিহরিয়া উঠিতেন যে, যে দুর্দ্দশাকে তিনি প্রচুর বলিয়া মনে করিতেছিলেন, তদপেক্ষা বহুগুণ দুঃখের ভার লাহিড়ী মহাশয়ের জন্য কাল স্বহস্তে সজ্জীকৃত করিতেছিল। লাহিড়ী মহাশয়ের যে দুঃখে তাঁহাদের প্রাণ ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার সংসারের যে বিশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁহারা কাতর হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা কত অধিক দুঃখ, যন্ত্রণা ও শোকবেগ তাঁহাকে নীরবে মস্তক পাতিয়া লইতে হইয়াছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রত্যেক কার্য্যেই তাঁহার স্বভাব পরিস্ফুট হইত। এই ক্ষুদ্র পত্রখানি একটি পংক্তি বহন করিয়া ধন্য হইয়াছে যে, বর্দ্ধমানের কবিরাজ মহাশয়ের “ঔষধের ব্যয়ের জন্য তোমার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই।” লাহিড়ী মহাশয়ের মাসিক আয় মাত্র পেন্সনের ঐ পঁচাত্তরটি টাকা। তদ্দ্বারা এতগুলি রোগীর চিকিৎসা,

পথ্য ও শুশ্রূষাকারিগণের ব্যয় সঙ্কুলান হওয়া কি সম্ভবপর? তাঁহার এই দুঃসময়ে তাঁহার ছাত্রগণ ও বন্ধুগণ তাঁহাকে নানারূপে সাহায্য করিতেন।

কৃষ্ণনগরে আসিয়া ইন্দুমতীর অবস্থার কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য হইল না। রোগ উত্তরোত্তর ভীষণাকার ধারণ করিতে লাগিল। চিকিৎসকগণ জবাব দিয়া চলিয়া গেলেন। নবকুমার যখন বুঝিলেন যে, ইন্দু তাঁহার জন্যই প্রাণ দিলেন, তখন তাঁহার মৃত্যুযন্ত্রণা উপস্থিত হইল। কি করিলে ভগ্নীর রোগের একটুকুও উপশম হয়, ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দুমতীর শেষমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃত্যুর কিয়ৎকালপূর্ব্বে ইন্দুমতী পিতাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভগিনীকে বলিলেন, "দিদি, বাবাকে একবার ডাক।" তখনি রামতনু বাবুকে ডাকিয়া আনা হইল। তিনি আসিয়া দেখিলেন ইন্দু যন্ত্রণায় বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পিতাকে দেখিয়া ইন্দু তাঁহার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাতরকণ্ঠে কহিলেন, "বাবা, আজ আমার কাছে একটু ব'স; আজ আমাকে বড় অস্থির কর্‌ছে।" লাহিড়ী মহাশয় নিকটে বসিয়া কন্যার হাতখানি নিজের হাতে তুলিয়া লইয়া কহিলেন, "ইন্দু, মা, আমাদের যাহা করিবার ছিল সকলি

করিয়াছি ; আর কিছু করিবার নাই। এক্ষণে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, তিনি তোমাকে শীঘ্র এ যাতনা হ'তে উদ্ধার করুন।” ইন্দু বক্ষঃস্থলে দুই হাত তুলিয়া বলিলেন, “ঈশ্বর আমাকে উদ্ধার কর।” শুনিয়াছি একান্তমনে প্রার্থনা করিলে ভগবান প্রার্থনাকারীকে তাহার অভীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন। বুঝি বা ইন্দুমতীর কাতর প্রার্থনা তাঁহার চরণতলে পৌঁছিয়াছিল। ইন্দুমতী পিতার মুখের দিকে তাকাইয়া তখনি অনুমতি চাহিলেন, “বাবা, আমি যাই ?” লাহিড়ী মহাশয় অকম্পিতকণ্ঠে কহিলেন, “যাও”। সেই মুহূর্ত্তেই প্রাণবায়ু ইন্দুমতীর রোগক্ষীণ দেহযষ্ঠি পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। আনন্দপ্রভা সুবর্ণলতিকা ভূতলে পড়িয়া রহিল। যেন এক প্রবল বাত্যা সহসা আবির্ভূত হইয়া বনমধ্যস্থিত আশ্রয়তরু হইতে স্বর্ণলতাকে ছিঁড়িয়া লইয়া গেল।

ইন্দুমতীর মৃত্যুতে গৃহ যেন নিরাশার অন্ধকারে আবৃত হইল। এই ঘটনায় কৃষ্ণনগরের বাড়ীতে যে শোকের ছায়া পড়িল, লাহিড়ী মহাশয়ের অশেষ চেষ্টাতেও তাহা অপসারিত হইল না। নবকুমার প্রাণে বড় আঘাত পাইলেন। তিনিই ইন্দুমতীর এই অকালমৃত্যুর কারণ—ইহা মনে করিয়া জীবনের উপর নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইলেন। ইহার পর যে কয়দিন তিনি

জীবিত ছিলেন, এক প্রকার মৌনাবলম্বন করিয়াই কাটাইয়াছেন। কেহ তাঁহাকে আর হাসিতে দেখে নাই। ক্রমে ক্রমে জীবনীশক্তি পলে পলে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিল। আত্মীয় বন্ধুগণের বহু চেষ্টাতেও কোন উপকার দর্শিল না। অবশেষে পর বৎসরের ১৪ই সেপ্টেম্বর প্রাণপাখী নবকুমারের জীর্ণ দেহপিঞ্জর ভগ্ন করিয়া অমরধামে প্রস্থান করিল।

কয়েকমাসের মধ্যেই এই ঘটনাদ্বয় ঘটিল। শোক-বিহ্বলা মাতা গতায়ুর ন্যায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন। যে প্রাণসম পুত্রকন্যাকে হৃদয়ের শোণিতে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, সেই অন্ধের যষ্ঠি, নিরাশার আশা, বৃদ্ধবয়সের অবলম্বন একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। যেন চক্ষের সমক্ষে মিলাইয়া গেল, তাহার কোনই প্রতীকার হইল না। জননী শোকে আকুলা, অধীরা হইলেন; লাহিড়ী মহাশয় কিন্তু প্রশান্ত, ধীর ও অবিচলিত রহিলেন। কৃষ্ণনগরে তাঁহার আলয়ে কতিপয় যুবক মিলিত হইয়া মধ্যে মধ্যে ধর্ম্মালাপ করিতেন। যে দিবস নবকুমারের মৃত্যু হয়, যুবকগণ তাহা জানিতেন না; তাঁহারা পূর্ব্ব-প্রথামত ঘরের ভিতরে যাইতেছেন, এমন সময় লাহিড়ী মহাশয় ত্বরিতপদে আসিয়া কহিলেন, "তোমরা ও ঘরে যেও না। অল্পক্ষণ পূর্ব্বে নবকুমারের মৃত্যু হ'য়েছে,

তার মৃতদেহ ঐ ঘরে রয়েছে। তোমরা যেও না, দেখ্‌লে কষ্ট হবে।” সকলে ত অবাক্‌।

দুঃখে যাঁহারা অনুদ্বিগ্নমনা, সুখে যাঁহারা স্পৃহাশূন্য, ভয়, আসক্তি, এবং ক্রোধ যাঁহাদের দূর হইয়াছে, তাদৃশ আত্মমননশীল মহাত্মারাই স্থিতপ্রজ্ঞ।* ঘটনা-পরম্পরা দেখিয়া মনে হয় লাহিড়ী মহাশয়ও এই পদবীতে আরূঢ় হইবার যোগ্যতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পারিবারিক দুর্ঘটনার কথা শ্রবণ করিয়া না ব্যথিত হয়, এমন মানুষ দেখা যায় না। পত্নী শোকে মুহ্যমানা, পুত্রকন্যাগণের কাতর ক্রন্দনে গৃহ আকুলীকৃত, বন্ধুবান্ধবগণের শোকের পরিসীমা নাই, কিন্তু লাহিড়ী মহাশয় প্রশান্ত ও ধীর। তিনি ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপে এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে, পুত্রকন্যা তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিয়াছে ভাবিয়া প্রাণে শান্তি অনুভব করিতেন। জ্যেষ্ঠপুত্রের মৃত্যুর পরদিবস প্রাতঃকালে তাঁহার গুণরাশি স্মরণ করিতে করিতে লাহিড়ী মহাশয় তাঁহার দৈনিক লিপিতে লিখিয়াছেন ঃ—

* “দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভোগক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥”
গীতা, ২য় অঃ ৫৬ শ্লোক।

"১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৮, শনিবার প্রাতঃকাল। ৭০ বৎসর বয়সের বৃদ্ধের অন্ধের যষ্ঠি, যাহা কিছু সাধ্য ভিক্ষা করিয়া, বন্ধু ও ছাত্রদের সাহায্যে মানুষ করিয়া, শিক্ষা দিয়া, যথাসাহায্য চিকিৎসা করা—যেমন হওয়া উচিত সেই প্রকার লেখাপড়ায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া, চরিত্রবান্ হইয়া—এই অসহায় বৃদ্ধবয়সে এমন প্রাণসম পুত্রকে বিসর্জ্জন দিয়া আজ প্রাতঃকালে আর লেখনী চলে না—

Blessed are they that mourn, for they shall be comforted.

ডাক্তার দুর্গাদাস গুপ্ত বলিয়াছেন মেডিকেল কলেজের প্রত্যেক ছাত্রের মুখে শুনা যাইত 'আমি নবকুমারের মত হইব'।"

এই সময়ে বাহিরে তিনি অনুত্তরঙ্গ হ্রদের ন্যায় প্রশান্ত ছিলেন; কিন্তু তাঁহার অন্তরের অভ্যন্তরে কিরূপ প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল, কিরূপ অধ্যবসায়, দৃঢ়তা ও সহিষ্ণুতার সহিত তিনি মনোবৃত্তিসকলকে দমন করিয়া তাহাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে স্থির রাখিয়াছিলেন, ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যখনি লোকান্তরিত পুত্রকন্যার সদ্‌গুণরাশি বন্ধুবর্গের মুখে মুখে শ্রদ্ধার সহিত আলোচিত হইত,

যখনি নিত্য নৈমিত্তিক শত শত গৃহকার্য্যের ভিতরে তাহাদের অদৃশ্য হস্ত দেখিতে পাইতেন, অশনে বসনে দ্রব্যসামগ্রীতে তাহাদের দুঃখময় স্মৃতি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন, তখনি অন্তরের অন্তরতম প্রদেশের রুদ্ধদ্বার সবলে মুক্ত করিয়া করুণ ক্রন্দনধ্বনি বাহিরে আসিতে চাহিত। যাঁহারা অকালে সন্তান হারাইয়া পার্থিব সুখে বীতরাগ হইয়া করুণাময় ভগবানের কৃপাকণার ভিখারী হইয়াছেন, তাঁহার চরণযুগল সাগ্রহে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া শোকশঙ্কু উন্মূলীত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, তাঁহাদের জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া প্রাণে শান্তি আনয়ন করিতেন। কখনও শোকবিহ্বলা পত্নীকে মধুর বচনে বুঝাইতেন, "তোমার দুঃখ করিবার কারণ নাই। যথাসাধ্য চিকিৎসা করিয়া তুমি যখন কাহারও বিন্দুমাত্র যন্ত্রণার লাঘব করিতে সমর্থ হইলে না, দিবারাত্রি শয্যাপার্শ্বে থাকিয়া ও অনুক্ষণ বহুপ্রকারে শুশ্রূষা করিয়াও তুমি যখন কাহাকেও আরোগ্যের পথে আনিতে পারিলে না, তখন আর দুঃখ করিও না। দয়াময়ের অমৃতময় চরণতলে তাহারা আশ্রয় লইয়াছে, তথায় রোগ নাই, শোক নাই, দুঃখ নাই, দারিদ্র্য নাই—পার্থিব দুঃখ কষ্টের লেশমাত্রও তথাকার আনন্দপূর্ণ বায়ু স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা সেই আনন্দময় লোকে মঙ্গলস্বরূপের

ক্রোড়ে সুখে অবস্থান করিতেছে। তোমার ও আমার যখন কাল পূর্ণ হইবে, আমরাও তাঁহার চরণতলে পৌঁছিব, তখন তাহাদের সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইবে।” লাহিড়ী মহাশয় এইরূপে মনকেও বুঝাইতেন।

“পৃথিবীটা মিথ্যা, সংসারটা মায়ার খেলা মাত্র, পুত্র-কন্যা, ভাইবন্ধু সকলই ক্ষণস্থায়ী জলবুদ্বুদ্বৎ”—এ সকল কথায় ব্যথিতের, পীড়িতের বা শোকার্ত্তের সান্ত্বনা হয় না। শিলাখণ্ড যেমন দুর্ব্বারবেগশালিনী স্রোতস্বিনীকে পথিমধ্যে রোধ করিতে পারে না, তেমনি প্রাণ যখন হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে, তখন সে অশ্রুপ্রবাহকে সহস্র প্রবোধবাক্যেও নিরুদ্ধ করা যায় না। লাহিড়ী মহাশয় একদিন উপাসনা করিতে করিতে “ইন্দু” বলিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া গেলেন। মুহূর্ত্তমধ্যেই তিনি মনকে শান্ত করিয়া একটি বন্ধুকে বলিলেন, “ভগবানকে দয়াময় বলি, মঙ্গলময় বলি। কিন্তু তাঁকে মঙ্গলস্বরূপ বলিয়া ধরা কত কঠিন। ইন্দু ত তাঁর অমৃতময় ক্রোড়ে সুখে আছে, তবে আমি কেঁদে দুঃখ প্রকাশ করি কেন?” এই ক্ষণিক দুর্ব্বলতা প্রকাশের জন্য লাহিড়ী মহাশয় বড়ই অনুতপ্ত হইলেন।

নবকুমারের মৃত্যুর পর বৎসর লাহিড়ী মহাশয় সকলকে লইয়া কলিকাতা আসিলেন। প্রাণসম পুত্র-

কন্যার মৃত্যুর পর কৃষ্ণনগরের বাড়ী মাতার নিকট শ্মশান সমান বোধ হইতে লাগিল। তিনি কিছুতেই ঐ বাড়ীতে বাস করিতে পারিলেন না। লাহিড়ী মহাশয় সপরিবারে কলিকাতা আসিলেন। কর্ম্মভূমি কলিকাতা—যেস্থানে প্রত্যূষে পক্ষীকুলের প্রভাতকূজনের পূর্ব্ব হইতেই কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হয়, যেস্থানে সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধনশীল জনসংঘাত রাজপথ আকীর্ণ করিয়া ফেলে, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি রাজবর্ত্ম, বিপণিশ্রেণী, বিদ্যামন্দির, আফিসসমূহ লোককোলাহলে মুখরিত থাকে, যেস্থানে অর্থ ভিন্ন মুহূর্ত্ত চলে না,—সেই শোভা ও ঐশ্বর্য্য-ময়ী মহানগরী কলিকাতায় নিঃসম্বল রামতনু অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার আশায় গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া আসিলেন। কোথায় থাকিবেন, কি করিয়া চলিবে, চিন্তা করিবার অবসর হইল না। কিন্তু ভগবানে যাঁহার দৃঢ়-বিশ্বাস, তাঁহার চরণে যাঁহার একান্ত নির্ভর, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার দুঃখমোচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। লাহিড়ী মহাশয় কলিকাতা আসিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, বহু হৃদয় তাঁহার দুঃখে কাতর, বহু মহৎ হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রীতি, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তাঁহার দিকে প্রধাবিত, বহু উদার পরিবারের নিভৃত গৃহের শান্তিময় কোণে তাঁহাদের জন্য স্থান সযত্নে সংরক্ষিত। সত্যই, যেন কেহ আসিয়া

পূর্ব্বে সংবাদ দিয়া তাঁহাদের সুবিধার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিল! লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্রাধিক শিষ্য স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয় আপনার ব্যয়ে বাড়ীভাড়া করিয়া শোকসন্তপ্ত গুরুদেবকে স্থাপন করিলেন। নীরব-কর্ম্মী, ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্যপরায়ণ কালীচরণ, রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জন্য যেরূপ পরিশ্রম, স্বার্থত্যাগ ও অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, পিতার জন্য পুত্রই কেবল ঐরূপ করিয়া থাকেন। তিনিই নবকুমারের পীড়ার সময় নিজের বাটীতে রাখিয়া তাঁহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, তাহাতে পীড়ার উপশম হইল না দেখিয়া তিনিই তাঁহাকে পশ্চিমে বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য রাখিয়া দেন, এবং তিনিই নবকুমার ও ইন্দুমতীর মৃত্যুর পর বহুদিন পর্য্যন্ত বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয়ের সেবা ও সাহায্য করেন।

এই সময়ে বিদ্যাসাগর মহাশয় রামতনু বাবুর যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে ইহাঁরা বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। লাহিড়ী মহাশয় প্রভূত অর্থব্যয়ে পরোপকার করিতে পারেন নাই, তিনি বিবিধ বাক্যকৌশলে আপনার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া শ্রোতৃ-বর্গের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হন নাই, অথবা দেশের ও দশের উপকারের নিমিত্ত কোন সদনুষ্ঠানের সূত্রপাত করিয়া যান নাই। তিনি যৎকালে জীবিত ছিলেন

তৎকালে তাঁহার অপেক্ষা অর্থবান্, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান ও সংসারজ্ঞানাভিজ্ঞ বহুব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। কিন্তু এসকল সম্পদ্ তাঁহার বিশেষ না থাকিলেও, নিষ্কলঙ্ক চরিত্রমাহাত্ম্যে তিনি সকলের মান্য ও পূজ্য ছিলেন। বিদ্যাসাগরের ন্যায়বিচারের কষ্টিপাথরে লাগিয়া অনেকেরই বন্ধুত্ব অল্পদিনেই পর্য্যবসিত হইত, কিন্তু তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ও সাধু স্বভাবের মাধুর্য্যে বিদ্যাসাগর চিরজীবন তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধু ছিলেন। লোক দ্বারা, অর্থ দ্বারা, শরীর দ্বারা,—যখন যেরূপে সম্ভব, বিদ্যাসাগর রামতনু বাবুকে সহোদরাধিক যত্নে সাহায্য করিতেন। বন্ধুবর্গের সমবেত চেষ্টা, আগ্রহ ও সাহায্যের ফলে লাহিড়ী মহাশয় কষ্টেসৃষ্টে কলিকাতা বাস করিতে লাগিলেন।

এই সকল দুর্ঘটনার মধ্যেও লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শরৎকুমার কোনও রূপে এণ্টান্স পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইলেন। তৎপর তিনি এফ্, এ, পড়িবার জন্য রাজসাহী গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিবারিক গোলযোগে তাঁহার আর পড়া হইল না। শোকতপ্ত বৃদ্ধ পিতামাতার সান্ত্বনা ও শুশ্রূষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের নিকটে থাকিতে হইত। শরৎকুমার পড়া ছাড়িয়া দিয়া কিয়দ্দিন কর্ম্মের সন্ধানে ঘুরিলেন।

বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহাদের কষ্ট দেখিয়া একদিন তাঁহাকে আপনার মেট্রপলিটান কলেজের লাইব্রেরীয়ানের পদে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

শরৎকুমার পাঁচ বৎসর এই লাইব্রেরীয়ানের কার্য্য করিয়াছিলেন। তাঁহার এই কার্য্য গ্রহণ করায় পরিবারের কথঞ্চিৎ উপকার হইল বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদের অর্থাভাব দূর হইল না। তৎপর অনেক চিন্তা করিয়া শরৎকুমার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। চেষ্টা যাঁহার সাধু, প্রবৃত্তিসমূহ যাঁহার সৎপথাবলম্বী, পরিশ্রমে যিনি অকাতর, এ জগতে কোন বিষয়েই তাঁহাকে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হয় না। শরৎকুমার বৃদ্ধ জনকজননীর ভরণপোষণের ও তাঁহাদের কষ্টলাঘবের সঙ্কল্প করিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সরল সাধুতায় দিনে দিনে লোক তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার পিতৃবন্ধুগণের মধ্যে অনেকেই নানা উপায়ে তাঁহার উন্নতির প্রয়াসী হইলেন। ইহঁাদের মধ্যে অশেষগুণসম্পন্ন মহাত্মা রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায়, সি, এস্, আই, বাহাদুরের নাম শীর্ষস্থানীয়। শরৎকুমার যখনই কোনরূপ অসুবিধায় পড়িয়াছেন, যখনই অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, রাজা অনুমাত্রও চিন্তা না করিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত অর্থ ও সৎপরামর্শ দিয়া

বিপন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন! বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন যে, প্রথমে কত কষ্ট করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিতে হয়। সময়ে আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করিলে তবে কোন বিষয়ে উন্নতি লাভ করা যায়। এ জগতে পরিশ্রম ভিন্ন কোন কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। এই মুহূর্ত্তেই হৃদয় আশায় ও আগ্রহে উদ্বেলিত হইয়া উঠে, পরক্ষণেই আবার নৈরাশ্যে মুহ্যমান হইয়া পড়ে। এ সঙ্কটে সৎপথ অবলম্বন ও ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পন্ন করা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। শরৎকুমারের ব্যবসায়ের উন্নতির মূল তাঁহার নিরহঙ্কার, অনালস্য, কর্ত্তব্যজ্ঞান, সাধুতা ও কঠোর শ্রম। এক্ষণে তাঁহার কারবারই বাঙ্গালী পুস্তক-ব্যবসায়ি-গণমধ্যে বোধ হয় সর্ব্বপ্রধান। উন্নতির এই শিখরদেশে আরোহণ করিতে তাঁহাকে কি কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে, পঞ্চবিংশ বৎসর ধরিয়া তাঁহাকে কি গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। এক্ষণে প্রায় আশী জন কর্ম্মচারী এই কারবারে নিয়ত কার্য্য করিতেছেন।

শরৎকুমারের পুস্তকের ব্যবসায় আরম্ভ করিবার দুই বৎসর পরেই কৃষ্ণনগরের ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া কনিষ্ঠ বিনয়কুমার স্থান-পরিবর্ত্তনের জন্য মুঙ্গেরে চলিয়া

গেলেন। সেখানে তাঁহার পীড়ার কোনই প্রতীকার হইল না। আগষ্ট মাসে বিনয়কুমার তথায় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সকলে ভগ্নপ্রাণে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। শরৎকুমারের ব্যবসায়ের উন্নতির চিহ্ন ক্রমেই স্পষ্ট হইতে লাগিল। দুঃখের অমানিশার অবসানে স্নিগ্ধকোমল উন্নতির ঊষালোকে ভাগ্যাকাশ যখন রঞ্জিত হইয়া উঠিল, তখন জননীদেবী কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তিনি শুধু দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার পুত্রগণ দুস্তর দুঃখ-সাগর অতিক্রম করিয়া উন্নতি এবং সমৃদ্ধির উপকূলে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। যেন এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতেই দুঃখ, দারিদ্র্য, রোগ, শোকে জর্জ্জরিত, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি জননী গঙ্গামণি দেবী স্বর্গারোহণ করিলেন। তাঁহার শুধু দুঃখই সার হইল! এই সন্তানশোকাতুরা, অশেষদুর্দ্দশা-পীড়িতা রমণীর চরিত আলোচনা করিলে অশ্রুসম্বরণ করা যায় না। পতির প্রতি একান্তনির্ভরশীলা এই মহীয়সী মহিলা যে কষ্ট সহ্য করিয়াছেন তাহা অবর্ণনীয়। রামতনু বাবু যখন উপবীত পরিত্যাগ করিলেন, তখন ইহাঁকে কি দারুণ নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। তিনি ত নিরন্তর বন্ধুবর্গ ও শিষ্যমণ্ডলী

পরিবেষ্টিত হইয়া অবস্থান করিতেন, কিন্তু এই মহিলাকে সর্ব্বদা একাকিনী অবস্থান করিতে হইত। সন্তানরক্ষা ও গৃহকার্য্যে ইহাঁকে সাহায্য করিবার অন্য কেহ ছিল না। চিরজীবন পতির মুখের দিকে তাকাইয়া সংসারের সকল কষ্ট ইনি নীরবে সহ্য করিয়া গিয়াছেন। পূতচরিত্রা এই আদর্শ গৃহিণীর চরিত আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।

নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ সংসারের রীতি নহে। দীর্ঘজীবী হওয়া যেমন সুখের হেতু তেমনি আবার দুঃখেরও কারণ। লাহিড়ী মহাশয় শেষজীবনে বহুশোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পত্নীব মৃত্যুতে তাঁহাকে বিচলিত করিয়াছিল। তাহার অল্পদিন পরেই অকৃত্রিম বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্বর্গা-রোহণ, ও তাঁহার শোক পুরাতন হইতে না হইতে কনিষ্ঠ কালীচরণের মৃত্যু, এবং তাহার অব্যবহিত পরেই পুত্রাধিক প্রিয় শিষ্য কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের পরলোক গমনে লাহিড়ী মহাশয় যেন কেমন হইয়া গেলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহারও দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যাঁহাদিগকে লইয়া সংসার-পথে যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই সকল জীবনসঙ্গী একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিলেন। লাহিড়ী মহাশয় অতঃপর যে কয়দিন জীবিত ছিলেন, পার্থিব কোন বিষয়ের প্রতি আর তাঁহার মন ছিল না। সেই অশীতিপর বৃদ্ধের নিরন্তর ভগবচ্চিন্তাপূত

মুখমণ্ডলে যেন স্বর্গের ছায়া নামিয়া আসিয়াছিল। এই সময়ে একদিন ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে দেখিতে আইসেন। লাহিড়ী মহাশয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবুকে দেখিয়া আগ্রহে উঠিয়া বসিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং কিরূপে তাঁহাকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিবেন, তজ্জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন। আহ্লাদে তাঁহার ঋষিমূর্ত্তি উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। এমন আগ্রহের সহিত কথোপকথন হইল, যাহাতে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই প্রীত ও মুগ্ধ হইয়া গেলেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র বাবু প্রস্থান কালে লিখিয়াছেন ঃ—

"অনেক বৎসর পরে আজ রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার সেই যৌবনের স্ফূর্ত্তি উৎসাহ উদ্যম—সেই অটল জ্ঞানস্পৃহা, সেই সকল পুরাতন কথা মনে পড়িল। এখন আর সে ভাব নাই; বার্দ্ধক্যের মুখশ্রীতে আর এক অনুপম সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইতেছে। রামতনু বাবুর ঠিক বয়স কত জানি না; তাঁহার ইন্দ্রিয়সকল এখনও সতেজ দেখিলাম, স্মরণশক্তিও জাগ্রত। তাঁহার প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া বোধ হইল, তাঁহার পা যদিও পৃথিবীর ধূলি স্পর্শ করিতেছে—কিন্তু তাঁহার আত্মা আশা ভরসা সকলি স্বর্গের দিকে উন্নত।

বিশাল অটল হেন হিমগিরিবর,
মেঘমালা ভেদ করি পরশে অম্বর ;
ঘনঘটা ঝঞ্ঝাবাত ছায় বক্ষোপরে,
অখণ্ড তপন তাপ জ্বলিছে শিখরে। *

এইরূপ মহাত্মাদিগের জীবনালেখ্য দর্শনে আমাদের এই ক্ষুদ্র হৃদয়ে বল ও আশার সঞ্চার হয়।”

এই সময়ে শরৎকুমার ব্যবসায়-লব্ধ অর্থে হ্যারিসন রোডে এক সুন্দর ত্রিতলগৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন, এবং সেই নবনির্ম্মিত গৃহে পিতাকে স্থাপন করিয়া দাস দাসী পরিবৃত করিয়া দিলেন। যতদূর সম্ভব পার্থিব সুখে রামতনু বাবুকে পরিবেষ্টিত করা হইল। কিন্তু মন যাঁহার ভগবানের উদ্দেশ্যে ধাবিত, কোন্ পার্থিব সুখে তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয়? আত্মীয়, বান্ধব, শিষ্য প্রভৃতি একে একে তাঁহাকে ছাড়িয়া যাইতে লাগিলেন, লাহিড়ী মহাশয়ও যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে একদিন কেমন করিয়া খাট হইতে পড়িয়া তাঁহার পা ভাঙ্গিয়া যায়। যতদিন জীবিত ছিলেন পা আর সারিল না,

* As some tall cliff that lifts its awful form,
Swells from the vale, and midway leaves the storm,
Though round its breast the rolling clouds are spread,
Eternal sun-shine settles on its head.”

Goldsmith.

ক্রমে শেষমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুগণ তাঁহার শেষ অভিলাষ শুনিবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। লাহিড়ী মহাশয় অতি ক্ষীণকণ্ঠে একটি সঙ্গীত করিতে অনুরোধ করিলেন,—"মলিন পঙ্কিলমনে কেমনে ডাকিব তোমায়।" একটি সুগায়ক ঐ গানটি ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিলেন। শুনিতে শুনিতে লাহিড়ী মহাশয়ের মুখমণ্ডল যেন উজ্জ্বল-তর হইয়া উঠিল। দেখা গেল তাঁহার ওষ্ঠাধর অল্প অল্প কাঁপিতেছে। তিনি ঐ গানটি বোধ হয় মনে মনে আবৃত্তি করিতেছিলেন। জীবন-পথের সর্ব্বশেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া, স্বানুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহের উপর ত্বরিৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, লাহিড়ী মহাশয় আসন্নকালে জগদীশ্বরের শরণাগত হইয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিতেছিলেন, "প্রভো, মলিন পঙ্কিলমনে কেমনে ডাকিব তোমায়।" ইহজীবনে যিনি জ্ঞানে-অজ্ঞানে কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন নাই, যাঁহার সমস্ত জীবন ঐকান্তিক ভগবদ্‌ভক্তির নিদর্শনস্বরূপ, প্রমাথী ইন্দ্রিয়নিচয়ের উপর যাঁহার একাধিপত্য ছিল, যিনি একটি সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পুষ্প দেখিয়া বিশ্বস্রষ্টার অপূর্ব্ব কৌশলের প্রশংসা করিতে করিতে আবিষ্টের ন্যায় হইয়া যাইতেন, সেই নিষ্কলুষচরিত্র সাধু রামতনু জীবনের শেষ-মুহূর্ত্তে কাতরকণ্ঠে ভগবানকে ডাকিতেছেন, "প্রভো, মলিন পঙ্কিলমনে কেমনে ডাকিব তোমায়"। মানুষের শক্তি কত

ক্ষুদ্র, মানুষ যখন দেখে চতুর্দ্দিকৃস্থ মায়ামোহে, সংসারের সহস্র প্রলোভনে তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিয়া পদে পদে পদস্খলিত করাইতেছে, আপনার সমগ্র চেষ্টাতেও সে সহজ পথে অগ্রসর হইতে পরিতেছে না, তখন স্বীয় তুচ্ছশক্তির উপর আস্থাশূন্য হইয়া বড় কাতরপ্রাণে ভগবানকে ডাকিতে থাকে। লাহিড়ী মহাশয় বুঝিয়াছিলেন তাঁহার জীবন শেষ হইয়া আসিয়াছে, আর সময় নাই, এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার করুণাভিক্ষা না করিলে আর হইল না, তাই অনন্যচিন্ত্য হইয়া প্রাণের সমগ্র শক্তিতে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন,—হে নিরুপায়ের উপায়, আমার পঙ্কিল মন এ জনমে আর নির্ম্মল হইল না। কত দিন অপেক্ষা করিয়া থাকিলাম, কই, মন ত অনাবিল হইল না। প্রভো, তোমার পুণ্যস্পর্শ ভিন্ন বোধ হয় এ মনের মলিনতা উঠিল না। ভাবিয়াছিলাম শেষে মনের আবিলতা নষ্ট হইবে, কিন্তু জীবন ত শেষ হইয়া আসিল, তোমাকে ত তেমন করিয়া ডাকা হইল না। আজ আর কোন্ আশায় অপেক্ষা করিয়া থাকিব? আমার ডাক্ পড়িয়াছে, আর বিচার করিবার সময় নাই। দয়াময়, এ জীবন মন সমস্তই তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম। এইরূপে ভগবানকে ডাকিতে ডাকিতেই চক্ষু মুদ্রিত হইল। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্ট লাহিড়ী মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলেন।

লাহিড়ী মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ সহরে প্রচারিত হইবামাত্র দলে দলে শিক্ষিত ভদ্রলোকে শরৎকুমারের গৃহ ভরিয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহার গৃহের সম্মুখবর্ত্তী হ্যারিসন রোডে বহুলোক সমবেত হইল। সকলের মুখেই এক কথা, "দেশের একজন সাধুলোক গেলেন।" যথাসময়ে সকলে মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া শ্মশানাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শবসঙ্গে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ভদ্রলোক দেখিয়া বিস্মিত জনমণ্ডলী "কে গেলেন" জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের নাম উচ্চারিত হইবামাত্র সকলে একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "দেশের একজন সাধুলোক গেলেন।" ক্রমে সকলে শ্মশানক্ষেত্রে পৌঁছিয়া তাঁহার দেহ চিতানলে অর্পণ করিলেন। প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নি সহস্রশিখা বিস্তার করিয়া লাহিড়ী মহাশয়ের নশ্বর দেহ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।

এইরূপে সুখে দুঃখে রামতনুর সুদীর্ঘ জীবন-নাটকের যবনিকা পতিত হইল। জগতের নীতি-বীরগণের অক্ষয় ইতিহাসে ভগবদ্‌বিশ্বাসী সাধু রামতনুর জীবন-কাহিনী চিরদিনের জন্য রক্ষিত হইবে। দুঃখে নিরুদ্বিগ্নমনা এবং সুখে স্পৃহাশূন্য, ভগবানের প্রতি একান্তনির্ভরশীল অহংজ্ঞানপরিশূন্য রামতনুর চরিত আলোচনা করিলে, শোকাতুর ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ ব্যক্তি প্রাণে শান্তি পাইবেন।

কণ্টকময় বন্ধুর সংসারপথে কীর্ত্তিমন্দিরের স্বর্ণচূড় তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল না। ঐশ্বর্য্য এবং কর্ত্তৃত্ব তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না। যে গুণে মানুষের মনুষ্যত্ব, রামতনুতে তাহা প্রচুর মাত্রায় পরিস্ফুট হইয়াছিল। কর্ত্তব্যপ্রিয়, দৃঢ়ব্রত, সত্যানুরাগী রামতনু প্রাণপণে ন্যায়ানুমোদিত প্রত্যেক কার্য্যের সহায়তা করিতেন। অন্যায় এবং দুর্নীতি তাঁহার ভয়ে সঙ্কুচিত থাকিত। রামতনুর সাধুতা, বিনয়, ঈশ্বরে পরানুরক্তি, কর্ত্তব্যজ্ঞান ও ধৈর্য্য বঙ্গীয় যুবকগণের আদর্শস্বরূপ হইয়া তাঁহাদিগকে সত্যপথে পরিচালিত করুক ইহাই প্রার্থনীয়।

পরিশিষ্ট।

গল্প ও কথাসংগ্রহ।

লাহিড়ী মহাশয় মধ্যে মধ্যে স্বর্গীয় কালীচরণ ঘোষ মহাশয়ের আলয়ে অবস্থিতি করিতেন, কখনও বা প্রিয় ছাত্র শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন বসু মহাশয়ের গৃহেও দুই চারি-দিন বাস করিতেন। একদিন কালীচরণ বাবুর বৈঠকখানায় অনেক ভদ্রলোক লাহিড়ী মহাশয়কে তাঁহার বাল্যজীবনের কাহিনী বলিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। রামতনু বাবু একটু আধটু আপত্তি করিলেন, কিন্তু বন্ধুগণের পীড়া-পীড়িতে শেষে বলিতে স্বীকৃত হইলেন। নিতান্ত সঙ্কুচিত হইয়া আরম্ভ করিলেন,—"ছেলেবেলায় আমি বড় মন্দ ছিলাম—" পার্শ্বে টেবিলে কালীচরণ বাবু লিখিতেছিলেন, তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন, "আপনি ভাল হ'লেন কবে?" উপস্থিত সকলেই এই রহস্যে প্রীত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লাহিড়ী মহাশয় নিতান্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন, "তাই ত, কালীচরণ ঠিক বলেছেন, ভাল ত হই নাই।" আর বলা হইল না। বন্ধুবর্গের

বহু অনুরোধেও লাহিড়ী মহাশয় আর একটি কথাও বলিলেন না।

লাহিড়ী মহাশয় যদিও অতি বিনীত ও শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, তথাপি তাঁহার যথেষ্ট আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। ভাগলপুরে অবস্থিতিকালে তিনি একদা নিমন্ত্রিত হইয়া তথাকার কমিশনার মহোদয়ের আলয়ে উপস্থিত হন। বহু অজাতশ্মশ্রু নব্য সিভিলিয়ানের মধ্যে পক্ককেশ রামতনু বাবুকে দেখিয়া একজন নবাগত যুবক সিভিলিয়ান বাঙ্গালী জাতির প্রতি কটাক্ষ করিয়া দুই এক কথা রামতনু বাবুকে শুনাইয়া দেন। লাহিড়ী মহাশয় এইরূপ বিনা কারণে স্বজাতির নিন্দা শ্রবণ করিয়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও ঐ সাহেবকে দুই চারি কথা শুনাইয়া দিলেন। তৎপরে কমিশনার মহোদয় মধ্যে পড়িয়া গোলযোগ মিটাইয়া দেন।

এই ঘটনার পর প্রায় কুড়ি বৎসর অতীত হইয়া গেল। অশীতিপর বৃদ্ধ লাহিড়ী মহাশয় একদিন গ্রেট্ ইস্টারণ হোটেলের নিকট গাড়ীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে এক দীর্ঘাকৃতি ইংরাজ রাজপুরুষ রামতনু বাবুর গাড়ীর নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিষ্টার লাহিড়ী, আপনি কি আমাকে চিনিতে পারেন?" লাহিড়ী মহাশয় বহু চেষ্টা করিলেন, কিছুতেই এই ভদ্রবেশধারী সাহেবটিকে চিনিতে

পারিলেন না। সাহেব খ ন স্মিতহাস্যে কহিলেন, "আমি সেই ভাগলপুরের গ্রিম্‌লে!" লাহিড়ী মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহে করমর্দ্দন করিলেন, অনেক প্রাচীন কথা তুলিয়া কিয়ৎকাল আলাপ করিয়া মিঃ গ্রিম্‌লে চলিয়া গেলেন। রামতনু বাবু সাহেবের ভদ্রতায় ও মধুর আলাপে পরম পরিতুষ্ট হইলেন। মিঃ গ্রিম্‌লে তৎকালে 'বোর্ড অব্ রেভিনিউ'তে এক উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

মনে একরূপ মুখে অন্যরূপ ইহা লাহিড়ী মহাশয় কখনও ভালবাসিতেন না। এই সত্যপ্রিয়তার জন্য তাঁহার জীবন-প্রবাহ অন্য পথে প্রবাহিত হইল। তিনি যাহা ভালবাসিতেন না, লোকলজ্জাভয়ে কদাচ তাহার অনুষ্ঠান করিতেন না। ভাগলপুরের তৎকালপ্রসিদ্ধ উকিল অতুলচন্দ্র মল্লিক মহাশয়ের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব ছিল। তিনি প্রায়ই অতুল বাবুর বাটীতে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতেন। একদিন ভৃত্য অতুল বাবুর গুড়গুড়িতে তামাক আনিয়া দিয়াছে, দিব্য মিষ্ট গন্ধ অল্প অল্প ধূমের সহিত নির্গত হইতেছে, এমন সময়ে লাহিড়ী মহাশয়কে দেখিয়া অতুলবাবু ভৃত্যকে গুড়গুড়ি লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। লাহিড়ী মহাশয় বসিয়াই ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন। তিনি তখনই অতুল বাবুকে কহিলেন, "আমাকে দেখিয়া ওটা লুকাইলে কেন?

তামাক খাওয়া যদি অন্যায় বলিয়াই মনে কর, তবে কাহারও সাক্ষাতে খাইও না। আর যদি তাহা না হয়, তবে সকলের সমক্ষেই খাইতে পার। লুকাইবার কোন প্রয়োজন দেখি না।” অতুলবাবু বিশেষ অপ্রতিভ হইলেন।

কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে কর্ম্ম করিবার সময়ে একদিন তাঁহার স্কুলের দেরাজ হইতে একটি জিনিস অন্তর্হিত হয়। লাহিড়ী মহাশয় অনেক চেষ্টা করিয়াও জিনিসটি না পাইয়া বড় বিমর্ষ হইলেন। মধু নামক একজন কলেজের চাকরের উপর তাঁহার সন্দেহ হইল। তিনি দুই একটি শিক্ষককে এই কথা বলিলেন, এবং স্বয়ং মধুর গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই দ্রব্যটি পুনরায় প্রাপ্ত হইলেন। মধুর উপর তাঁহার যে অন্যায় সন্দেহ হইয়াছিল, এবং দুই এক জনকে সে কথা বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, সেইজন্য মধুকে ডাকাইয়া সর্ব্বসমক্ষে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। এই সত্যপ্রিয়তা ও ন্যায়পরতা লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনের প্রায় প্রত্যেক ঘটনাতেই পরিস্ফুট।

রামতনুবাবু কখনও আত্মপ্রচার ভালবাসিতেন না। তাঁহার সহপাঠী ও সঙ্গিগণ বহু সভাসমিতি করিতেন, কিন্তু তিনি একদিনের তরেও অগ্রণী হইয়া কোন কার্য্য করেন

নাই। বন্ধুগণের সকল কার্য্যেই তাঁহার প্রাণের সহানুভূতি ছিল, কিন্তু তিনি পুরোবর্ত্তী হইয়া বহুজনসমক্ষে বক্তৃতা করিতে চাহিতেন না। একদিন "মাদকদ্রব্যনিবারিণী" সভায় হাইকোর্টের বিচারপতি স্বর্গীয় শম্ভুনাথ পণ্ডিত মহাশয় সভাপতি হইবেন, বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইল। নির্দ্ধারিত সময়ের পূর্ব্বেই সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইল; ক্রমে সভারম্ভের সময় উত্তীর্ণপ্রায় হইয়া গেল, কিন্তু শম্ভুনাথ আসিলেন না। উদ্যোগকর্ত্তা স্বর্গীয় প্যারিচরণ সরকার মহাশয় চিন্তিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া সমবেতজনমণ্ডলী মধ্যে সভাপতি হইবার উপযুক্ত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। প্যারিচরণ দেখিলেন, সর্ব্বশেষ পংক্তিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রামতনু বাবু দাঁড়াইয়া আছেন! অমনি ধরিয়া ফেলিলেন। বিদ্যাসাগর ও লাহিড়ী মহাশয় উভয়েই আপনাদিগের অনুপযুক্ততা জানাইলেন, কিন্তু প্যারিচরণ কি ছাড়িবার পাত্র? যাহা হউক, গোলমাল হইতে হইতে শম্ভুনাথ উপস্থিত হইয়া সকলেরই লজ্জানিবারণ করিলেন।

যদিও পার্থিব হিসাবে কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য রামতনুর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল না, তথাপি তাঁহার সমকালবর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গের উপর তাঁহার অসাধারণ প্রভাব ছিল। তিনি কখনও যশঃপ্রার্থী হইয়া কোন কর্ম্ম

করিতেন না। যাহা সৎ, যাহা উত্তম, যাহা ন্যায়ানুমোদিত তিনি চিরজীবন তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। তৎকালে বঙ্গের সুসন্তানগণ প্রায় সকলেই রামতনুর সহপাঠী অথবা বন্ধু ছিলেন। এই সকল মহাত্মাদিগকে, রামতনু তাঁহার নৈসর্গিক বিনয়, সাধুতা, ভগবদ্‌ভক্তি, পরোপকারেচ্ছা ও সত্যপ্রিয়তা দ্বারা মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামতনু অতি বিনীত এবং কোমলপ্রকৃতি ছিলেন। এই বিনয়নম্রতার জন্য তিনি বন্ধুবর্গের প্রতিষ্ঠিত করতালী-প্রতিধ্বনিত সভায় কখনও অগ্রণী হইয়া বক্তৃতা করিতে পারেন নাই। যে বক্তৃতাতরঙ্গাঘাতে হিন্দুসমাজের মূলদেশ অবধি কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল, রামতনু তাহাতে একটি কথাও বলেন নাই। তাঁহার উপর যে কার্য্যের ভার ন্যস্ত ছিল, তিনি কায়মনোবাক্যে তাহার অনুষ্ঠান করিয়া সুসম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। স্বানুষ্ঠিত কার্য্যের পারিমাণ অল্প হইলেও, রামতনু তাঁহার পবিত্র জীবনের যে পুণ্যস্মৃতি রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতবাসীর নিকট তাহা অমূল্য।